শক্তিদেবীর বিবর্তন

SAKTI DEBIR BIBARTAN

by

Kamal Kmmar Sanyal

শক্তিদেবীর বিবর্তন

কমলকুমার সান্যাল

কমল পাবলিকেশনস্
পাবলিশার্স ও বুকসেলারস্
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৭০০০০৯।

প্রকাশক : শ্রীপরেশচন্দ্র সাঁতরা
কমল পাবলিকেশনস্
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৬০

প্রচ্ছদ : পঞ্চানন মালাকর

মুদ্রক :
গোপালচন্দ্র পাল
স্টার প্রিন্টিং প্রেস
২১/এ রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

কামাখ্যাকুমার বাগচি ও শান্তি বাগচিকে

ভূমিকা

ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রাচীন কাল থেকেই দেব-দেবীর উদ্ভব ঘটেছিল। ভারতবর্ষে দেব-দেবীর সংখ্যা অত্যধিক, এমনটা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। এমন কি দেব-দেবী নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এমন মাতামাতি আর কোথাও নেই। বৈদিক সভ্যতায় দেবতাদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু অবৈদিক অনার্য সভ্যতায় দেবীই ছিল প্রধান আরাধ্যা। সিন্ধুসভ্যতার জননীমূর্তি ও মহাদেবের মূর্তি পাওয়া গেছে। সিন্ধু সভ্যতায় শক্তিসাধনা ছিল। ভারতের অন্যত্র অনার্য জাতি এবং উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দেবী পূজিতা হতেন এবং প্রায় সর্বত্রই বিশেষত দ্রাবিড়দের মধ্যে তান্ত্রিক ক্রিয়াচার একটা প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। আদিমকাল থেকেই ভারতের প্রায় সর্বত্রই আদিম অধিবাসীরা শক্তি পূজায় বিশ্বাসী ছিল। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বিভিন্ন দেবীর পরিকল্পনা হয়েছিল। অনার্যদের ধর্মবিশ্বাস, তান্ত্রিক ক্রিয়াচার প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যে নিন্দিত হয়েছে। কিন্তু আর্যরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্যের কালে অনার্য দেবীদের গ্রহণ করে সকলকে এক মূল মহাশক্তির সঙ্গে যুক্ত করে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দেন। কিভাবে এটা ঘটেছে বইটিতে তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বইটিতে এমন অনেক মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে যা অনেক গোঁড়া ভক্তদের পছন্দ হবে না। কিন্তু কোন উপায় নেই। যা সত্য বলে মনে করেছি তা অকপটে বলেছি। অবৈজ্ঞানিকের মত অন্ধ সংস্কার নিয়ে ভক্তি গদগদচিত্তে বইটি রচিত হয়নি। নিরাসক্তভাবে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ কৌতূহলী পাঠকের অনেকেই উপকৃত হবেন

এবং আনন্দ পাবেন। যদি কোন একজন পাঠকও বইটি পড়ে আনন্দ পান তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

পরম হিতৈষী শ্রীপরেশচন্দ্র সাঁতরা গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্যে তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীর শ্রীমতী কল্পনা গাঙ্গুলী, শ্রীমতী জল্পনা গাঙ্গুলী, শ্রীতপন চক্রবর্তী প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সরবরাহ করে এবং শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় নির্ঘণ্ট রচনার কাজে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন, সেজন্যে তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

ইতি—

ক. কু. সা

॥ ১ ॥

"The oldest concept in summerian theology was the mother Goddess"—কেবলমাত্র প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতায় মাতৃকাদেবীর ধারণা ছিল, গর্ডন চাইল্ডের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। সুমেরীয় সভ্যতার সমকালীন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় মাতৃদেবীর অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ। প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার অন্তর্গত মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পায় মাতৃমূর্তি পাওয়া গেছে। মাতৃদেবীর ধারণা প্রাগৈতিহাসিক কালের অনেক প্রাচীন সভ্যতায় দেখা যায়। পৃথিবীর একেবারে আদিম চারটি সভ্যতার (সুমেরু, মিশর, সিন্ধু, চীন) মধ্যে প্রত্যেকটিতেই মাতৃ দেবীর যাকে শক্তির আধার বলা হয় সেই শক্তিদেবীর কল্পনা পরিলক্ষিত হয়। মাতৃদেবীর ধারণা এই খানেই থেমে থাকেনি। চারটি আদিম সভ্যতার ঠিক পরে পৃথিবীর অনেক প্রাচীন সভ্যতায় মাতৃদেবীর কল্পনা দেখা যায়। কোথাও কোথাও এই কল্পনা ও ধারণা পরিণত রূপ নিয়েছে। প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে মাতৃদেবী নানা নামে অভিহিত হয়েছে। যেমন—রোমে সিবিলি, গ্রীসে রী অ্যাফ্রোদিতো, মেকসিকোয়, ৎলিল্লি ইলল্লি, ব্যাবিলনে ঈশতার, মিশরে ঈসিস, ইসরাইলে য়হু, জার্মানিতে নের্থাস, ফিনিসীয়দের আশতার্তে, আরবে আললাৎ-অল্‌উজ্জা এবং ভারতে শক্তিদেবী তথা মাতৃদেবী বিভিন্ন নামে অভিহিত ও পূজিত। ভারতে সব দেবীই মাতৃদেবী। এখানে দেবীর সংখ্যা অনেক। সব দেবী মাতৃদেবী হলেও সকলেই শক্তিদেবী নন। ভারতে শক্তি দেবী ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পুরাণের যুগে একটা পরিণত রূপ পেয়েছে।

ভারতে মাতৃদেবীর বিবর্তনের কথা বলবার আগে আর একটি বিষয় উল্লেখ্য। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে কয়েকটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। আহরণ ও শিকার যুগে এবং শিকার ও পশুপালন যুগে মানুষ প্রধানত যাযাবর ছিল।

বেঁচে থাকার জন্যেই তখন কোন একস্থানে বসবাস করবার সুযোগ ছিল না। ফলে ধর্মীয় চিন্তা ও ধারণার উদ্ভব হলেও তার বিকাশ ঘটেনি। মানুষ যখন চাষ আবাদ শিখল এবং কৃষি-নির্ভর অর্থ-নীতির যুগে প্রবেশ করলো তখন মানুষের স্থায়ীভাবে কোন এক স্থানে বসবাসের সুযোগ এল। কৃষি-নির্ভর অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় সমাজ-ব্যবস্থা আস্তে আস্তে হয়ে উঠল মাতৃতান্ত্রিক। তাই দেখা যায় মাতৃতান্ত্রিক কৃষিসমাজে মাতৃদেবতার কল্পনা করা হয়েছে। মানুষ আগেই বুঝতে শিখেছিল নর-নারীর মিলনে নতুন প্রাণের আবির্ভাব হচ্ছে। প্রাচীন কালেই পৃথিবীকে মা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে আকাশকে পিতা বলা হয়েছে। পৃথিবীর বহু পুরাণে আকাশ ও পৃথিবী যথাক্রমে পিতা ও মাতারূপে কল্পিত হয়েছে। এই দুই মাতা-পিতার মিলনে অন্য সব-কিছুর জন্ম। আমাদের ঋগ্বেদে পৃথিবীকে বলা হয়েছে 'মাতা পৃথিবী মহীয়ং' এবং আকাশকে বলা হয়েছে দৌষ্পিতা। ভূমি কর্ষণ করে শস্য উৎপাদনের চিন্তা মেয়েরাই প্রথম করে। সন্তান উৎপাদন কিভাবে হয় সেই ব্যাপারটি তারা আগেই জানত। তার ওপর তারা দেখলো বন্য অবস্থায় এমনিতেই কিছু শস্য ভূমিতে জন্মায়। তারা চিন্তা করলো ভূমি কর্ষণ করলে ভাল শস্য উৎপাদন করা নিশ্চয়ই যাবে। ভূমিকে আগেই মাতৃরূপে কল্পনা করা হয়েছে। পুরুষ যদি নারীকে কর্ষণ করে সন্তান উৎপাদন করতে পারে তাহলে মাতৃরূপী ভূমিকে কর্ষণ করলে ফল পাওয়া সম্ভব। এই চিন্তা থেকে তারা পুরুষের লিঙ্গের মত যষ্টি বানিয়ে ভূমি কর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করে। নিশ্চয়ই প্রথম ফসল তোলার উৎসব হয়েছিল। সম্ভবত সেই উৎসবে লিঙ্গ ও শক্তি পূজা হয়েছিল। পুরুষেরা মেয়েদের কাজ দেখে বিস্মিত হয়েছিল। তারা ভাবলো মেয়েরাই শক্তির মূল উৎস। *Animism* গ্রন্থে নৃতাত্ত্বিক *Clodd* বলেছেন,—*"In earth worship is to be found explanation of the mass of rites and ceremonies to ensure fertilisation of the crops*

and cattle and woman herself." মাতৃতান্ত্রিক কৃষিসমাজে মাতৃদেবীর উৎপত্তি। কারণ এই সময় মানুষ দেখল মানুষ একদিকে পরিবারের ও সমাজের কর্ত্রী নারী তথা মা অন্যদিকে কৃষকের কাছে পৃথিবী অন্নদা। পৃথিবীর গর্ভে শস্য জন্মায়। আবার সেই শস্য প্রাণদায়িনী। তিনিই সৃষ্টির আধার, তিনিই পালয়িত্রী। সুতরাং তিনিই আদিমাতা। পৃথিবী জননী, কল্যাণী, প্রকৃতিরূপা, প্রাণরূপা। মানুষ এবং শস্য তাঁর সন্তান। একদিকে সমাজকর্ত্রী মাতার অন্যদিকে শস্য প্রদায়িনী মাতার উপলব্ধি থেকে বিশ্বকর্ত্রী মাতার ধারণা।

পৃথিবীর অনেক দেশে কৃষি-নির্ভর সংস্কৃতিতে মাতৃদেবী তথা শক্তিদেবীর কল্পনা এবং তার আরাধনা প্রচলিত হলেও ভারতবর্ষেই তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। শক্তিদেবীর পূজা এবং আরাধনা আদিম কাল থেকে আজো বহতা ধারার মত প্রবহমান।

।। ২ ।।

পূর্বে উক্ত আদিম ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল শিব ও শক্তির কল্পনা। ভারতবর্ষে শক্তির উপাসনা বৈদিক উপাসনা নয়। আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেছিল আনুমানিক ২০০০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। আর্য আগমনের বহুপূর্বে ভারতে নগর সভ্যতা ছিল। এই সভ্যতাকে বলা হয় সিন্ধুসভ্যতা। সিন্ধুসভ্যতার বয়স ২৫০০ থেকে ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। সিন্ধুসভ্যতার প্রাদুর্ভাব কালেই আর্য আগমন ঘটেছিল। আর সিন্ধুসভ্যতার পতন ঘটেছিল আর্যদের হাতেই। অনার্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা তারা গ্রহণ করেনি। বহুকাল পর্যন্ত তারা অনার্য সভ্যতার প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছে। অনার্য সংস্কৃতিকে তারা ঘৃণা করতো। তদুপরি আর্যরা কৃষিকাজ জানতো না। শক্তি পূজা ও মূর্তিপূজার প্রচলন তাদের মধ্যে ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণের ২।৩৭-৮ উক্তি থেকে আর্য সভ্যতার তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে—"প্রথমত দেবতারা

একটি মানুষকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করলেন, তার উৎসর্গীকৃত আত্মা অশ্বদেহে প্রবেশ করলো। দেবতারা অশ্বকে উৎসর্গ করলেন। উৎসর্গীকৃত আত্মা অশ্বদেহ থেকে বলীবর্দে প্রবেশ করলো। বলীবর্দকে উৎসর্গ করা হয়। উৎসর্গীকৃত আত্মা মেষ দেহে প্রবিষ্ট হলো। মেষকে উৎসর্গ করা হয়। মেষের আত্মা ছাগদেহে প্রবিষ্ট হলো। ছাগকে উৎসর্গ করা হলে তার আত্মা পৃথিবীতে প্রবেশ করলো। দেবতারা পৃথিবী খনন করে গম ও যব আকারে ওই আত্মাকে পান। তখন থেকে সকলে কর্ষণ করে শস্য পেতে থাকে।" বুঝতে পারা যায় আর্যরা ভূমি কষণ জানতো না। সুতরাং তাদের মধ্যে শক্তি বা মাতৃপূজার প্রথা ছিল না।

আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদে বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহুবিধ বিবরণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে দেবতাদের প্রাধান্য দেখা যায়। দেবতারা অসীম শক্তিরূপে কল্পিত হয়েছে। অবশ্যই ঋগ্বেদে নারী দেবতাও স্থান পেয়েছে। নারী দেবতার বন্দনায় কোথাও শক্তিময়ী রূপের আভাস পাওয়া যায় না। জগতের আধার রূপে শক্তিতত্ত্বের কল্পনা থাকা সত্ত্বেও আর্যরা শক্তির উপাসনা করতো না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১২৫ নং সূক্ত বাক্সূক্তে জগতের আদি কাবণ রূপে শক্তিতত্ত্বের কল্পনা আছে—

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহংমিত্রা বরুণোভা বিভর্ম্ম্যহমিন্দ্রাগ্নি অহমশ্বিনোভা ॥ ১

....

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
তাং মাং দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভুরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীং ॥ ৩

....

অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬

বাক্দেবীর উক্তি : আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যগণের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও

বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দুই অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি ॥ ১ আমি রাজ্যের অধিশ্বরী, ধনউপস্থিত করিয়াছি, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এতাদৃশ আমাকে দেবতারা নানা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, আমার আশ্রয়-স্থান বিস্তর, আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছি ॥ ৩ রুদ্র যখন স্তোত্রদ্বেষী শত্রুকে বধ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন আমিই তাঁহার ধনু বিস্তার করিয়া দিই। লোকের জন্য আমিই যুদ্ধ করি। আমি দ্যুলোক ও ভূলোকে আবিষ্ট হইয়া আছি ॥ ৬) (অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত) বাক্‌দেবীর উক্তির মধ্যে কোন শক্তি-তত্ত্বের এবং তন্ত্রধর্মের পরিচয় নেই।

বাক্‌দেবী ছাড়াও বেদে আরও অনেক দেবীর নাম পাওয়া যায়। যেমন—উষা, অদিতি, রাত্রি, পৃথিবী, সরস্বতী, শ্রী, ধিষণা, ইন্দ্রাণী, ইলা, সীতা, সূর্যা, অরণ্যানী, অসু, পৃশ্নি, সিনীবালী-রাকা-কুহু প্রভৃতি।

ঋগ্বেদে পৃথিবীকে মাত্র একটি সূক্তে পঞ্চম মণ্ডলের ৮৪ নং সূক্তে সুজলা সুফলা মাতৃদেবীর স্তুতি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—"হে পৃথিবী, ফলতঃ এস্থলে তুমি পর্বত সকলের খণ্ডধারণ করিতেছ। তুমি বলশালী ও শ্রেষ্ঠ, কারণ তুমি মাহাত্ম্য দ্বারা পৃথিবীর প্রীতিবিধান কর ॥ ১ হে বিচিত্র গমনশালিনী পৃথিবী, স্তোত্রীবর্গ গমনশীল স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করেন। হে অর্জুনী, তুমি শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় বারিপূর্ণ মেঘকে উৎক্ষিপ্ত কর ॥ ২ যৎকালে দীপ্তিশালী অন্তরীক্ষ হইতে ত্বদীয় মেঘের বৃষ্টি পতিত হয়, তৎকালে তুমি দৃঢ় পৃথিবীর সহিত বৃক্ষসকলকে বলপূর্বক ধারণ করিয়া রাখ ॥ ৩ (অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত)

ঋগ্বেদের আর কয়েকটি সূক্তে পৃথিবীকে দ্যৌষ্পিতার সঙ্গে স্তুতি করা হয়েছে। আর্যরা যখন ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে অনার্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় তখন তারা অনার্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে অনার্যদের দেব-দেবীকে নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়ে নেয়। তাই দেখা যায় 'অথর্ব্ব বেদের' একাদশ কাণ্ডে পৃথিবীকে দেবীরূপে কল্পনা করে তার অসীম উপকারের কথা ও মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে

ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭০ নং সূক্তে আকাশকে ধবাতলবাসীব জনক ও পৃথিবীকে মাতা বলে সম্বোধন কবা হয়েছে—

॥ "উর্জংনো" দৌশ্চ পৃথিবীচ পিন্বতাংপিতামাতা বিশ্ববিদ্যাসুদংসা॥

৬।৭০।৬

দেখা যাচ্ছে পৃথিবীকে মাতা হিসেবে ব্যাপকভাবে গ্রহণ কবা হয়েছে অনার্য সংস্কৃতিব সংস্পর্শে আসাব পব।

ঋগ্বেদে কুড়িটি সূক্তে উষাকে দেবীরূপে স্তুতি কবা হয়েছে। উষা দেবীব অপূব রূপলাবণ্যেব স্তুতিব সঙ্গে তাঁব কিছু গুণেব কথাও বলা হয়েছে। উষাদেবী রূপে-গুণে অতুলনীয়া। তাঁব রূপে মুগ্ধ হয়ে সূর্য উষাদেবীকে অনুসবণ কবেন।

"সূর্যো দেবীমুষসং বোচমানাং মর্যোনাযোষামভ্যেতিপশ্চাৎ॥ ১।১১৫।২ মনুষ্য যেরূপ নাবীব পশ্চাৎ গমন কবে, সূয সেইরূপ দীপ্তিমান উষাব পশ্চাতে আসিতেছেন (অনুবাদ বমেশচন্দ্র দত্ত)। উষা হলেন সূর্যোদয়েব পূর্বেব অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যজ্ঞকর্মেব পূর্বে উষাদেবীকে আহ্বান কবে বলা হয়েছে—

অশ্বাবতীর্গোমতীবিশ্বসুবিদে ভূবি চ্যবন্ত বস্তবে
উদীবয় প্রতিমা সূনৃত্যা উষশ্চোদ বাধোমাঘানাম॥ ১।৪৮।২

....

আধাযোষেব সূনর্যুষা গতি প্রভুঞ্জতী
জবয়ন্তী বৃজন, পদদীয়ত উৎপাতয়তি পক্ষিণঃ। ১।৪৮।৫

....

বিশ্বান দেবাঁ আ বহ সোম পীতয়েহন্তেবিক্ষত্বষস্ত্বম।
সাস্মাসুধা গোমদশ্বাবত্বকথ্যমুষো বাজং সুবীযম্॥ ১।৪৮।১২

উষা অশ্বযুক্তা গোসম্পন্না এবং সকলধন প্রদাত্রী; প্রজাদিগেব নিবাসেব জন্য তাঁহাব অনেক সম্পত্তি আছে, উষা আমাকে সুনৃত বাক্য, বল এবং ধনবানদিগেব ধন দাও।......... উষা গৃহকর্যনেত্রী গৃহিণীর ন্যায় সকলকে পালন কবিয়া আগমন কবেন, তিনি জঙ্গম প্রাণী-

দিগকে জাগরিত করেন, পদযুক্ত প্রাণীদিগকে গমন করান, এবং পক্ষী-দিগকে উড়াইয়া দেন।······হে উষা তুমি অন্তরীক্ষ হইতে সকল দেবগণকে সোমপানার্থ আনয়ন কর। হে উষা তুমি আমাদিগকে অশ্বগোযুক্ত এবং প্রশংসনীয় ও বীর্যসম্পন্ন অন্ন প্রদান কর (অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত)।

বয়শ্চিত্তে পতত্রিণো দ্বিপচ্চতুষ্পদর্জুনি।
উষঃ প্রারন্নৃতুঁরনু দিবো আন্তেভ্যস্পরি ॥ ১।৪৯।৩

হে অর্জুনি উষা, তোমার আগমনের সময় দ্বিপদ ও চতুষ্পদ ও পক্ষযুক্ত পক্ষিগণ আকাশপ্রান্তের উপরিভাগে গমন করে (অনুবাদ রমেশ-চন্দ্র দত্ত)। প্রথম মণ্ডলের ১১৩ নং সূক্তে উষাদেবীকে বলা হয়েছে—

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষং জ্যোতিরাগাচ্চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্টবিভা।
যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায় এবা রাত্র্যুষসে যোনিমারৈক্ ॥ ১
রুশদ্বৎসারুশতী শ্বেত্যাগাদারৈগু কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ।
সমানবন্ধূ-অমৃতে অনূচী দ্যাবা বর্ণং চরত আমিনানে ॥ ২
·· ·····

জিহ্মশ্যেচরিতবে মঘোন্যাভোগয় ইষ্টয়ে রায় উ ত্বং।
দভ্রং পশ্যদ্ভ্য উর্বিয়াবিচক্ষ উষা অজীগর্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৫
········· ······················ ················

পরায়তী নামন্বেতি পাথ আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাং
ব্যুচ্ছংতী জীবমুদীরয়ংত্যুষা মৃতং কংচন বোধয়ংতী ॥ ৮
···

যাবয়দ্বেষা ঋতপা ঋতেজাঃ সুম্নাবরী সূনৃতা ঈরয়ংতী
সুমংগলীর্বিভ্রতী দেববীতিমিহাদ্যোষঃ শ্রেষ্ঠতমা ব্যুচ্ছ ॥ ১২
···

উদীর্ধ্বং জীবো অসুর্ন আগাদপ প্রাগাত্তম আ জ্যোতিরেতি।
আরৈক্পংথাং যাতবে সূর্যাযাগন্ম যত্র প্রতিবংত আয়ুঃ ॥ ১৬
মাতা দেবানামদিতেরনী বং যজ্ঞস্য কেতুর্বৃহতীবিভাহি।
প্রশস্তিকদরব্রহ্মণো নো ব্যুচ্ছ্য নো জনে জনয় বিশ্বপারে ॥ ১৯

জ্যোতিঃসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জ্যোতিঃ উষা আসিয়াছেন। তাহার বিচিত্র ও জগৎপ্রকাশক রশ্মিও ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। যেরূপ বাত্রি সবিতার প্রসূত সেইরূপ রাত্রিও উষার উৎপত্তির জন্য জন্মস্থান কল্পনা করিয়াছেন। ১ ॥ দীপ্তিমতী শুভ্রবর্ণা সূর্যের মাতা উষা আসিয়াছেন ; কৃষ্ণবর্ণা রাত্রি স্বীয়স্থানে গিয়াছেন ; রাত্রি ও উষা উভয়েই সূর্যের বন্ধু এবং উভয়েই অমর। একে অন্যের পর আগমন করেন, এবং একে অন্যের বর্ণ বিনাশ করেন ; এইরূপে তাঁহারা দীপ্তিমান হইয়া বিচরণ করেন। ২ ॥··· ······যে সকল লোক বক্র হইয়া শুইয়াছিল, উষা তাহার মধ্যে কাহাকেও ভোগের জন্য, কাহাকেও যজ্ঞের জন্য এবং কাহাকেও ধনের জন্য, সকলকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য জাগরিত করিয়াছেন। যাহারা অল্প দেখিতে পায় উষা তাহাদিগকে বিশেষরূপ দৃষ্টির জন্য অন্ধকার দূর করেন। বিস্তীর্ণ উষা সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ৫ ॥·········অতীত উষাগণ যে অন্তরীক্ষ পথ দিয়া গিয়াছেন সেই পথে উষা অনুগমন করিতেছেন, ভবিষ্যতে অনন্ত উষাগণ সেই পথ অনুধাবন করিবেন। উষা অন্ধকার দূর করিয়া জীবগণকে জাগরিত করিয়া মৃতবৎ সংজ্ঞাশূন্য লোককে চৈতন্যদান করেন। ৮ ॥ ···· তিনি বিদ্বেষীদিগকে দূর করেন, যজ্ঞপালন করেন, যজ্ঞার্থ প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনি সুখ প্রদান করেন এবং সুনৃত শব্দ প্রেরণ করেন। উষা কল্যাণবতী ও দেবগণের আকাঙ্ক্ষিত যজ্ঞ ধারণ করেন। হে উষা ! তুমি উৎকৃষ্টরূপে অদ্য এইস্থানে আলোক প্রকাশ কর। ১২ ॥········· হে মনুষ্যগণ ! উঠ, আমাদিগের (শরীর) পরিচালক জীবন আসিয়াছে, অন্ধকার গিয়াছে, আলোক আসিয়াছে। (উষা) সূর্যের গমনের জন্য পথ করিয়া দিয়াছেন ; যেখানে অন্ন দান করিয়া বর্ধন করিতেছে, তথায় যাইব। ১৬ ॥ ······হে উষা ! তুমি দেবগণের মাতা অদিতির প্রতি স্পর্ধিনী, তুমি যজ্ঞ প্রকাশ কর, বিস্তীর্ণ হইয়া কিরণ দান কর। আমাদিগের স্তোত্র প্রশংসা করিয়া আমাদিগের উপর উদয় হও, হে সকলের বরণীয়ে ! আমাদিগকে জনপদে প্রাদুর্ভূত কর। ১৯ ॥ (অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত)

ঋগ্বেদে রাত্রিদেবীর স্তবও দেখতে পাওয়া যায়। মাত্র তিনটি সূক্তে প্রথম মণ্ডলের ১০০ নং সূক্তে, দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩২ নং সূক্তে এবং দশম মণ্ডলের ১২৭ নং সূক্তে রাত্রিদেবীর স্তুতি করা হয়েছে। কারো কারো মতে রাত্রিদেবীর সূক্তে এবং পূর্বে উল্লিখিত বাক্‌সূক্তে বৈদিক-যুগের পরবর্তী কালে যে দুর্গার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তার বীজ ঋগ্বেদেই ছিল। এই মন্তব্য অযৌক্তিক। দুর্গার মূল কল্পনা অবৈদিক। অবৈদিক অনার্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলেই দুর্গাকে বৈদিক দেবতামণ্ডলীতে স্থান দেওয়া হয়। এ-বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। এখানে রাত্রিদেবীর বর্ণনার উল্লেখ করা যেতে পারে। সূর্য থেকেই রাত্রির জন্ম। সূর্য অস্তগামী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি আসে। আকাশ পুত্রী রাত্রিদেবীকে উষার ভগিনীরূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং রাত্রিকে দেবীর স্থানে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। দশম মণ্ডলের ১২৭ নং সূক্তে রাত্রিদেবীর স্তুতি করে বলা হয়েছে—

রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্য ক্ষভিঃ। বিশ্বা অধিশ্রিয়োহধিতঃ ॥ ১
ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুঃদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২
নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যয়তী। অপেদু হাসতে তমঃ ॥ ৩
সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি। বৃক্ষেন বসতিং বয়ঃ ॥ ৪
নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বংতো নি পক্ষিণঃ। নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫
যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেন মূর্ম্যে। অথানঃ সুতরাভব ॥ ৬
উপমা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত। উষঋণেব যাতয় ॥ ৭
উপতে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ। রাত্রিস্তোমং ন জিগ্যুষে ॥ ৮

রাত্রিদেবী আগমন পূর্বক চতুর্দিক বিস্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নক্ষত্র-সমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। দেবরূপিণী রাত্রিদেবী অতিবিস্তার লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা নীচে থাকেন, কি যাঁহারা উর্ধ্বে থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করিলেন। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করিয়াছেন। রাত্রিদেবী আসিয়া উষাকে আপন ভগিনীর ন্যায় পরিগ্রহ করিলেন, তিনি অন্ধকার দূরী-

ভূত করিলেন। পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে বাস করে, তদ্রূপ যাঁহার আগমনে আমরা শয়ন করিয়াছি, সেই রাত্রি আমাদিগের শুভকরী হউন। গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হইয়াছে, পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ, সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া শয়ন করিয়াছে। হে রাত্রি, বৃকী ও বৃককে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও; চৌরকে দূরে লইয়া যাও। আমাদিগের পক্ষে বিশিষ্টরূপে শুভকরী হও। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে, আমার নিকট পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। হে উষা-দেবী আমার ঋণকে যেমন পরিশোধ-পূর্বক নষ্ট কর, তদ্রূপ অন্ধকারকে নষ্ট কর। হে আকাশের কন্যা রাত্রি, তুমি যাইতেছ, তোমাকে গাভীর ন্যায় এই সমস্ত স্তব অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ কর (অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত)।

ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রাণীকে, যমরাজের মাতা সরণ্যুকে, অগ্নির স্ত্রী ইলাকে, সূর্যের পুত্রী সূর্যাকে, মরুদ্‌গণের মাতা পৃশ্নিদেবীকে, সিনীবালীকে লোকরক্ষিণী ও বহু প্রসবিনীরূপে, রাকাকে ধনদাত্রী হিসেবে স্তুতি করা হয়েছে। এরা কেউই প্রধান দেবীদের মধ্যে গণ্য নন। দশম মণ্ডলের ৫৯ নং সূক্তে অসূদেবীর বন্দনা আছে। একে প্রাণনেত্রীরূপে বন্দনা করা হয়েছে।

অসুনীতে মনো অস্মাসু ধারয় জীবাতবে সু প্রতিরান আয়ুঃ।
রারংধিনঃ সূর্য্যস্য সংদৃশি ঘৃতেন ত্বং তন্বং বর্ধয়স্ব ॥ ৫
অসূণীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম।
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যমুচ্চরন্তমনুমতে মৃড়য়ানঃ স্বস্তি ॥ ৬

হে অসুনীতি, আমাদিগের প্রতি মনোযোগ কর। আমরা যাহাতে বাঁচিয়া থাকি, সেই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে উৎকৃষ্ট পরমায়ুঃ প্রদান কর। যতদূর সূর্যের দৃষ্টি, তাহার মধ্যে আমাদিগকে থাকিতে দাও, আমরা তোমাকে ঘৃত দিতেছি, তাহাতে তোমার শরীর পুষ্ট কর। হে অসুনীতি আমাদিগকে আবার চক্ষু দান কর। আবার আমাদিগের প্রাণ আমাদিগের নিকট আনিয়া উপস্থিত কর, আবার ভোগ করিতে দাও।

আমরা যেন চিরকাল সূর্যোদয় দেখিতে পাই। হে অসুনীতি, যাহাতে আমাদিগের বিনাশ না হয়, তদ্রূপ আমাদিগকে সুখী কর (অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত)।

সীতা দেবীর স্তুতি করে বলা হয়েছে—

অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।

যথানঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি ॥ ৪ ৫৭ ৬

হে সৌভাগ্যবতী সীতা, তুমি অভিমুখী হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন প্রদান কর ও সুফল প্রদান কর (অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত)। এখানে যে সীতার উল্লেখ করা হয়েছে তা বাল্মীকি রচিত রামায়ণ কাব্যের সীতা নয়। এখানে সীতা শব্দের অর্থ হল কর্ষণের দ্বারা চিহ্নিত ভূমিরেখা। এখানে সীতাকে চিন্ময়ী ও সৌভাগ্য প্রদায়িনী দেবীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। রামায়ণে রামের স্ত্রীরূপে যে সীতার নাম পাওয়া যায় তা সম্ভবত সাংকেতিক নাম

(ঋগ্বেদে অরণ্যকেও দেবীরূপে স্তুতি করা হয়েছে।) অরণ্যের প্রতি মানুষের ভয় স্বাভাবিক। অরণ্যই নানা প্রকার জীব-জন্তুর আবাসস্থল। অরণ্যেই তস্করেরাও আশ্রয় নেয়। অরণ্যে মুনিগণ সাধনা করেন। আবার অরণ্যে নানা প্রকার সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়। পরে অরণ্য কেটে বাসযোগ্য ও চাষযোগ্য ভূমি তৈরী করা হয়। তবে একটা স্বাভাবিক ভীতি থেকেই অরণ্যকে দেবী বলা হয়েছে। দশম মণ্ডলে অরণ্যদেবীর স্তুতি আছে। দশম মণ্ডলটি অনেক পরে রচিত। মনে হয় অনার্য সংস্পর্শে আসার পর অরণ্যকে দেবীরূপে বন্দনা করা হয়েছে। অনার্যদের মধ্যে অরণ্য পূজা প্রচলিত ছিল। এখনো অনেক আদিবাসীদের মধ্যে অরণ্য পূজা বর্তমান। বাংলায় বনবিবির উপাখ্যান আছে

শুক্লযজুর্বেদে শ্রীদেবীর বর্ণনা আছে। শ্রী শব্দের অর্থ হলো লক্ষ্মী, সম্পদ, ঐশ্বর্য। এইসব সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে শ্রীদেবী বলা হয়েছে।

চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ংলোকে দেবজুষ্টামুদারাম

তাং পদ্মিনীমীং শরণমহং প্রপদ্যে অলক্ষ্মীর্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণে ॥

এই সূক্তের স্রষ্টা প্রার্থনা করেছেন, দেবতাগণ-কর্তৃক বন্দিতা পদ্মবিভূষিতা আনন্দপ্রদায়িনী শ্রীদেবীর আমি শরণাপন্ন—শ্রীদেবী অশুভকে বিনাশ করুন। যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষা নহং—শ্রীদেবীর অনুগ্রহেই যজমান গো, ধেনু, অশ্ব, পুত্র, সুবর্ণ প্রভৃতি লাভ করেন।

ঋগ্বেদে সরস্বতীদেবীর স্তুতিও পরিলক্ষিত হয়। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ নং সূক্তে, সপ্তম মণ্ডলের ৯৫ ও ৯৬ নং সূক্তে সরস্বতীদেবীর স্তুতি আছে। দশম মণ্ডলের ১৭ নং সূক্তে সরণ্যু, পূষা প্রভৃতির সঙ্গে সরস্বতীর স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়। তবে এই সরস্বতী পুরাণের যুগের সরস্বতী নয়। আর্যরা যখন অগ্রসর হতে হতে সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হলো তখন তারা সরস্বতী নদীর জলধারা দেখে শুধু মুগ্ধ হলো না তারা পরম উপকৃতও হলো। বৈদিক যুগের পর গঙ্গা নদীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয় এবং গঙ্গাকে দেবী হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে গঙ্গানদীর নাম আছে। বুঝতে পারা যায় আর্যরা প্রথম গঙ্গানদীর তীরে উপস্থিত হলে তার উল্লেখ করা হয়। বৈদিক যুগে সরস্বতী নদীর মহিমা ছিল উচ্চে। পুরাণের যুগে সরস্বতীকে বাগ্‌দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বৈদিকযুগে সরস্বতী নদী সুললিত ছন্দে প্রবাহিত হতো। এই নদীর প্রবাহকে লক্ষ্য করে ঋষিরা সরস্বতী বন্দনা করেছেন। সরস্বতীর বন্দনা ও বর্ণনাকে পরবর্তী কালে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঋগ্বেদে পৃথিবীকে যেমন মাতা বলা হয়েছে তেমনি অদিতিকেও মাতারূপে স্তুতি করা হয়েছে। আদিত্যগণের জননী হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আবার এই অদিতিকেই পৃথিবী বলা হয়েছে। পরবর্তী কালের অথর্ববেদে (১৩।১।৩৮) এবং তৈত্তরীয়সংহিতায় পৃথিবীর সঙ্গে অদিতিকে অভিন্নরূপে কল্পনা করা হয়েছে। আরও পরে অদিতিকে দক্ষ জননী এবং দক্ষ কন্যা উভয়রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। এই দক্ষ কন্যা

পরবর্তী কালে সতীতে রূপান্তরিত হয়েছিল কিনা বলা যায় না। অনার্য দেব-দেবী আর্য দেবতামণ্ডলীতে স্থান পাওয়ার পর বেদ, উপনিষদের অনেক উক্তিকে এক সূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে।

অনেকের মতে শক্তিদেবী আর্য সংস্কৃতির দান। এইমত সঠিক নয়। শক্তিদেবী যদি আর্য সংস্কৃতির দান হতো তাহলে বেদের প্রথম দিকে তার পরিচয় পাওয়া যেত। অনেক পরে আর্যরা অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে বাধ্য হয়। আর্যদের মধ্যে স্ত্রীলোকের অভাব ছিল। ঋগ্বেদের বহু সূক্তে স্ত্রীধন লাভের প্রার্থনা আছে। ক্রমে আর্যরা অনার্য রমণী বিয়ে করেছিল ব্যাপক হারে। এই অনার্য রমণীরাই আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তাছাড়া শক্তির সঙ্গে তন্ত্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আর্যদের মধ্যে তন্ত্রধর্ম ছিল না। তন্ত্রধর্ম অনার্য সংস্কৃতির অঙ্গ। পরে আমরা দেখবো কি-ভাবে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল এবং অনার্য দেবীরা আর্য দেবতা মণ্ডলীতে স্থান করে নিয়েছিল। এই সমন্বয়ের ফলেই আদিম শক্তিদেবী তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে পরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল। কোন না কোন প্রাকৃতিক অবস্থাকে ঋগ্বেদে দেব-দেবীরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

॥ ৩ ॥

আর্য আগমনের পূর্বে ভারতে এক প্রাচীন সভ্যতা মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় বিদ্যমান ছিল। এই সভ্যতাকে সিন্ধুসভ্যতা নামে অবিহিত করা হয়। কারণ সিন্ধু নদীর অববাহিকা অঞ্চলে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে সিন্ধুসভ্যতার কিছু সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধুসভ্যতার এমন কিছু মাতৃমূর্তি পাওয়া গিয়েছে যা প্রজনন শক্তির প্রতীক। শস্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করে কিভাবে লিঙ্গ ও ভূমি পূজা শুরু হয়েছিল

সেকথা আগেই বলেছি। সিন্ধুসভ্যতায় মূর্তিপূজার যে প্রচলন ছিল মাতৃমূর্তিগুলিই তার প্রমাণ। বৈদিক ধর্মে মূর্তিপূজা ছিল না এবং মহাশক্তিরূপিণী জগন্মাতার উপস্থিতি ছিল না। ঋগ্বেদের দেবতা-মণ্ডলীতে দেবীদের উপস্থিতি থাকলেও তাদের প্রাধান্য তেমন ছিল না এবং শক্তিদেবীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। বাক্ সূক্তে ও রাত্রিসূক্তে শক্তির কথা কিছু থাকলেও প্রাগার্য শক্তিদেবীর সঙ্গে তাকে তুলনা করা চলে না। শক্তি পূজা পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে প্রভাবিত করেছিল।

সিন্ধুসভ্যতার কথা বাদ দিলেও আর্যদের আগমনের সময়ে ভারতে যারা বাস করতো তাদের প্রায় সকলের মধ্যেই মাতৃদেবী তথা শক্তিদেবীর উপাসনা ছিল। পরবর্তী কালে আর্যসমাজে শক্তিদেবীর উপাসনার পশ্চাতে ভারতের আদিমতম জাতির সংস্কার ও মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। *R. S. Tripathi* তাঁর *History of Ancient India* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন,—"*From time immemorial India is the home of the worship of Prakriti or later Sakti.*" প্রকৃতি পূজা থেকে মাতৃপূজার প্রবর্তন ভারতে অনার্যদের মধ্যেই প্রথম দেখা যায়। শবর, পুলিন্দ, নিষাদ, কিরাত, দ্রাবিড় প্রভৃতি আদিবাসীদের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। স্বাভাবিকভাবেই তাদের ধর্মও ছিল মাতৃপ্রধান। তাদের ধর্ম পরিকল্পনায় মাতৃকাদেবী তথা শক্তিদেবীই প্রধান। এই দেবী সৃষ্টি শক্তি, পালনী শক্তি, সমাজ-নিয়ন্ত্রী শক্তি এবং ধ্বংসের শক্তি হিসেবে পূজিতা ছিলেন। পরবর্তী কালেও শক্তিদেবীকে এই একইরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

winternitz তাঁর *A History of Indian Literature* গ্রন্থে লিখেছেন,—"*There is no doubt that this goddess and her cult etc. unite traits of very different deities as well as non Aryan.*" শক্তি সাধনায় বহুযুগের সংস্কার মিলিত হলেও এতে অনার্য উপাদানই বেশি। অনার্য সংস্কৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ

করে শক্তিদেবীর বিবর্তন সম্ভব হয়েছে। শক্তিদেবীর বিবর্তনে আর্য ও আর্যেতর জাতির প্রভাব সংহত হয়েছে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্যে দিয়ে। প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক অতুল সুর তাঁর দীর্ঘকালের গবেষণার পর বলেছেন হিন্দুসভ্যতার গঠনের মূলে বারো আনা ভাগ হচ্ছে প্রাগার্য উপাদান। অতুল সুর ছাড়াও এই একই কথা বলেছেন—জন মারশাল, রমাপ্রসাদ চন্দ এবং ষ্টেলা ক্রামরিশ। অতুল সুর প্রমাণ করেছেন দশাবতারবাদ, কালী-করালী, ছিন্নমস্তা, মনসা, চণ্ডী, শীতলার পূজা, গাজন, চড়ক, হোলী, নবান্ন, পৌষপার্বন, নব পত্রিকা ও ঘেঁট পূজা, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতির আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, টোটেম বিশ্বাস ও ভক্তি, দেব-দেবীর বাহন কল্পনা, মাতৃ-শিব-লিঙ্গ, কুমারী, অশ্বত্থ, বটবৃক্ষ পূজা, মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা, ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া, আত্মায় বিশ্বাস প্রভৃতি প্রাগার্যদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে।

অম্বিকা এসেছে উত্তর অঞ্চল থেকে, চণ্ডী এসেছে বিন্ধ্য অঞ্চল থেকে। এদের সঙ্গে দ্রাবিড়দের দেবী অম্মাদের যোগ ঘনিষ্ঠ। অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় মোঙ্গল এদের সকলেরই সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক এবং এরা সকলেই মাতৃভাবাসক্ত। খিল হরিবংশে বিষ্ণুপর্বের ৩য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে দেবী শবর পুলিন্দ কিরাতদের উপাস্য দেবী—

পর্ব্বতাগ্রেষু ঘোরেষু নদীষ্ চ গুহাসু চ।
বাসস্তব মহাদেবি বনেষু পবনেষু চ॥
শবরৈর্ব্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সু পূজিতা।
ময়ুর পিচ্ছ ধ্বজিনি লোকান্ ক্রমসি সর্ব্বশঃ॥

শক্তিদেবীর পূজার প্রবর্তন আর্যদের নয়। আর্যরা অনার্য সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল এই সত্য স্বীকার করতে অনেকেই কুণ্ঠিত। কিন্তু সত্যকে স্বীকার করার মধ্যে অগৌরবের কিছু নেই। বরং সত্য স্বীকার করে নেওয়াই সমীচীন। ভারতের কেউই বিশুদ্ধ রক্তের অধিকারী নয়। তাই দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে দিয়ে আর্য-অনার্যের যে সমন্বয় ঘটেছিল তা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত। শক্তিদেবীর ইঙ্গিত যে বেদে রয়েছে তা

প্রমাণ করবার জন্যে কেউ কেউ নানা উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। আমরা আগে ঋগ্বেদের দেবীদের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখেছি তার মধ্যে শক্তিতত্ত্বের কোন সম্পর্ক নেই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বাক্ সূক্তের মধ্যে কিছু শক্তির কথা এবং পৃথিবীকে দেবী হিসেবে গ্রহণ করার মধ্যেও আছে অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ।

আগেই বলেছি শক্তির সঙ্গে তন্ত্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। 'সূত্রকৃতঙ্গ' নামে এক প্রাচীন জৈন গ্রন্থ থেকে জানা যায় তন্ত্রের আচার-অনুষ্ঠান অত্যন্ত গূঢ় এবং এটা শবর-পুলিন্দ, দ্রাবিড়, গন্ধর্ব প্রভৃতিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর তন্ত্রাভিলাষী সাধু সঙ্গ গ্রন্থে বক্রেশ্বরের তান্ত্রিক অঘোরীবাবার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন—"বেদের উৎপত্তিব বহু শতাব্দী পূর্বে তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্র মন্ত্রমূলক নয়, ক্রিয়া মূলক। অনার্যবঙ্গে আর্যরা যাদের ঘৃণা করতেন, সেই দ্রাবিড়দের ভাষাতেই তন্ত্রের যা কিছু ব্যবহার ছিল। পুঁথিপুস্তক তো ছিলই না, বেদের মতই লোক পরম্পরায় মুখে মুখে তার প্রচার ছিল। সাধকের স্মৃতির মধ্যেই তা বদ্ধ ছিল। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতির নাম গন্ধও ছিল না। কারণ তন্ত্রের ব্যবহার যে সব মানুষকে নিয়ে, তার মধ্যে জাত কোথায়? সাধারণ মানুষের ধর্মকর্ম নিয়েই তো তন্ত্রের সাধন। তন্ত্রের জগতে বা অধিকারে ঘৃণার বস্তু বলে কিছু ছিল না। শবসাধনা, পঞ্চমুণ্ডি আসন, মদ্য-মৎস্য-মাংসেব ব্যবহার এ সবইতো তন্ত্রের, আর্য ব্রাহ্মণদের ধারণায় ভ্রষ্টাচার। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণরা যতদিন বাঙলায় আসেননি, ততদিন তাঁদের এভাবের যে একটা ধর্ম সাধনা আছে, আর সেই ধর্মের সাধন প্রকরণ তাঁদেরই একদল গ্রহণ করে ভবিষ্যতে আর একটা ধর্ম গড়ে তুলবেন, একথা কল্পনায়ও আনতে পারেননি। তারপর তন্ত্রের ধর্ম গ্রহণ করে ক্রমে ক্রমে তারা অনার্য হয়ে পড়লেন—তাঁদের বৈদিক ধর্মের গুমোর আর কি রইল?"

অনার্যদের শক্তিতত্ত্ব এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত তন্ত্রধর্ম বৌদ্ধ, জৈন এবং আর্যদের প্রভাবিত করেছিল, অবশ্যই বৌদ্ধ ও আর্য-ব্রাহ্মণেরা.

তাকে দার্শনিক আবরণ দিয়েছিল। তবে অনার্য সংস্কৃতির কোথাও উন্নত রূপ দেখা দিয়েছিল, কোথাও বা তার অবনতি ঘটেছিল (শক্তি ও তন্ত্রকে নিয়ে অনাচার অনার্যদের মধ্যেও ছিল। তাদের মধ্যে যে বিকৃতি ছিল তা, পরবর্তী কালেও চালু হয়েছে), কোথাও তা রূপান্তরিত হয়েছিল। তবে প্রথমদিকে কিছু রূপান্তর ঘটলেও পুরাণে বিন্ধ্য-বাসিনী ও পর্ণশবরী প্রভৃতি দেবীকে অনার্যরূপেই গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলা ছিল শক্তি পূজার পীঠস্থান। বাংলার দেবীর বাহন ছিল সিংহ। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপ ও মধ্য-প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে মাতৃদেবীর সঙ্গে সিংহকে বাহন হিসেবে গ্রহণ করার মধ্যে বাংলার প্রভাব বিদ্যমান। আদিমকাল থেকেই বাঙলার মা হিসেবে উপাস্য দেবী ছিলেন চণ্ডী—মনসা—শীতলা—গন্ধেশ্বরী—বনবিবি প্রভৃতি। অনার্যদেবী কালী—শিব বাংলায় প্রবেশ করে আর্যায়িত হওয়ার পর। কিন্তু শক্তির উপাসনা পূর্বেই ছিল। মাতৃ আরাধনা অনাদিকালের।

প্রাগার্য মাতৃপূজার ধর্ম পরবর্তী কালে আর্য সমাজে গৃহীত হয়েছিল এবং তা তন্ত্রধর্মে বিকশিত হয়েছিল। (সম্ভবত আর্য অনার্যের সমন্বয় ঘটেছিল পৌরাণিককালে। এই সমন্বয়ের মূলে ছিল বৌদ্ধ অভিঘাত। বৌদ্ধেরা জাতিধর্মে বিশ্বাস করতেন না। তারা অন্ত্যজশ্রেণীর দেব-দেবীকে নিজেদের দেবতামণ্ডলীতে স্থান দিয়েছিল এবং মূর্তিপূজার প্রতি আস্থা দেখিয়েছিল। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীকে তারা কাছে টেনে নিয়েছিল। এর ফল সুদূর প্রসারী। বৈদিক ধর্মের গোঁড়ামিকে আঁকড়ে থাকার ফলে হিন্দুধর্মের জনপ্রিয়তা অনেক কমে গিয়েছিল। তারও পর অনেক আগে থেকেই আর্যরা অনার্যদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল। তাদের ধর্মের নিন্দা করেছিল। সে কথা মনে রেখেই অন্ত্যজ শ্রেণী হিন্দু ধর্মের ওপর বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধধর্ম সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্রসার ঘটিয়েছিল। পরে গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। (এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে কিছু গ্রহণ বর্জন করতে হয়। ফলে হিন্দুধর্ম নতুন ছাঁচে গড়ে ওঠে। সমাজের প্রসার এবং সংহতি

রক্ষার জন্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে টেনে আনার প্রচেষ্টা হলো। তখন থেকেই আর্য সমাজে প্রবেশ করলো অনার্য দেব-দেবী। নারী দেবতা তথা শক্তিদেবীর প্রবেশ ঘটলো।) অনেক নারী দেবতা এল পুরুষ দেবতার স্ত্রী হিসেবে। দেব-দেবীর বাহন দেওয়া হলো। এই বাহনগুলি অন্ত্যজ সমাজের কুলপ্রতীক বা টোটেম। অনেক বৈদিক দেবতা অপসারিত হলো, কেউ কেউ পেছনের সারিতে চলে গেল। আবার কেউ নতুন পৌরাণিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হলো। বৈদিক ধর্ম ছিল প্রধানত যাগ্-যজ্ঞ সম্পাদনের ধর্ম। নতুন পৌরাণিক ধর্মে স্থান পেল পূজা অনুষ্ঠান।

পৌরাণিক দেবতামণ্ডলীতে প্রধান স্থান পেলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। এঁদের মধ্যে শিব অনার্য দেবতা। তাঁর স্ত্রী দুর্গা। বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী। এঁরাও পূজা পেতে লাগলেন। নারী দেবতারাই বেশি জনপ্রিয় হলেন। পৌরাণিক ধর্মের প্রবর্তক আর্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা। সেই কারণে তারা বিষ্ণুকে বৈকুণ্ঠে স্থান দিলেন। বৈকুণ্ঠে হলো স্বর্গ। শিবকে কৈলাসে স্থান দেওয়া হলো। কৈলাস হলো মর্ত্যে। এইভাবে আর্য-অনার্যের সম্মিলন ঘটলো। বৈদিক দেবতাদের স্ত্রী ছিল এবং তাদের কাউকে কাউকে দেবী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রাধান্য ছিল না। পৌরাণিক যুগে নারীদেবতারা পুরুষ-দেবতার শক্তির উৎস হিসেবে চিহ্নিত হলেন। দুর্গা এলেন সর্বোচ্চ স্থানে। তাঁর সঙ্গে এলেন আরও অনেক দেব-দেবী। এমনকি যাঁরা গাছতলায় ও পাথরের গায়ে, জঙ্গলে ছিলেন তাঁরাও স্থান পেলেন আর্য দেবতামণ্ডলীতে। ঋগ্বেদের ইন্দ্রকে অত্যন্ত সাধারণ স্তরে নামিয়ে দেওয়া হলো। পৌরাণিক যুগেই অবতার-বাদে সৃষ্টি হয়েছিল। আর্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সৃষ্ট অবতারবাদে স্থান পেলেন বেদবিরোধী বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ। এই সময়েই রচিত হয়েছিল বিভিন্ন পুরাণগুলি। এই পুরাণগুলিতে অনেক কল্পনা ও অবাস্তবতা থাকলেও এর মধ্যে অতীত ভারতবর্ষের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমন্বয়ের বিচিত্র ইতিহাসের উপাদান পুরাণ কাহিনীগুলির মধ্যে আছে। শিব ও শক্তির আদিরূপ

প্রাগার্য সমাজে ছিল। সেই শিব ও শক্তি পূজার সূত্রে পৌরাণিক কালে তন্ত্র ধর্ম বিকাশ লাভ করেছিল। পৌরাণিক যুগে প্রাচীন অনেক আখ্যান ও উপাখ্যান নিয়ে ১৮টি মহাপুরাণ ও অনেকগুলি উপপুরাণ রচিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে রচিত হয়েছিল অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র। এই তন্ত্রশাস্ত্রগুলি বিভিন্ন দেব-দেবীকে উপলক্ষ্য ক'রে রচিত। পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক অতুল সুর বলেছেন—আর্য-অনার্যের সভ্যতার সংশ্লেষণ ঘটেছিল যেখানে যেটাকে আগে আমরা বলতাম মধ্যদেশ। তার মানে কাশী, কোশল, বিদেহ ইত্যাদি দেশ। সেখানে আর্যদের আপোষ করতে হয়েছিল অনার্যদের ভাষা সভ্যতা ও লোক সংস্কৃতির সঙ্গে। এটা বিবর্তনের ক্রমিক ধারাবাহিকতার ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল পৌরাণিক যুগে। সংশ্লেষণের পর আমরা ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ দেখি, যেটা বৈদিক সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। লোকে আর ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার স্তুতি গান করে না। বৈদিক যজ্ঞও সম্পাদন করে না। নতুন দেবতামণ্ডলীর পত্তন ঘটে। যজ্ঞের পরিবর্তে আসে পূজা ও উপাসনা। বৈদিক আত্মকেন্দ্রিক স্তুতিগানের পরিবর্তে আসে ভক্তি। এর উপর প্রাগার্য তান্ত্রিক ধর্মেরও প্রভাব পড়ে।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। পৌরাণিক ধর্মের প্রবর্তক আর্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা। এদেশের মানুষের সঙ্গে মিশতে মিশতে এবং পারিপার্শ্বিকতার চাপে আর্যদের আপোষ করতে হয়েছিল অনার্যদের সঙ্গে। ফলে অনার্য দেব-দেবী আর্য দেবতামণ্ডলীতে স্থান পেল। কিন্তু অনার্য দেব-দেবীদের আর্য দেবতামণ্ডলীতে স্থান দেওয়ার সময় তাঁদের অগ্নির সঙ্গে সমীকরণ করে নেওয়া হলো। শিব, দুর্গা, কালী, তারা, করালী প্রভৃতি দেব-দেবীর বেলায় এমনটি ঘটেছিল। বৈদিক যুগের অন্তিম কালে কালী করালী আর্যসমাজে স্থান পেয়েছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁদের স্বতন্ত্রতা প্রকাশ পায়নি। তাঁদের বৈদিক অগ্নি উপাসনার

অঙ্গ বিশেষ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু আর্যরা যখন ক্রমেই পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি হ্রাস পায়। ফলে কালী করালী, চণ্ডী তাঁদের স্বতন্ত্রতা নিয়েই পুরাণে স্থান পেলেন এবং আপন স্বরূপেই পূজা পেতে লাগলেন।

॥ ৪ ॥

পুরাণে শক্তির উপাসনা ও আরাধনার পূর্বে বৌদ্ধধর্মে শক্তি-তত্ত্বের ও তন্ত্রধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। পৌরাণিক ধর্মের আগেই বৌদ্ধধর্মে শক্তিদেবীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এটা অনেকেই সহজভাবে নিতে পারেন না। অনেক হিন্দুদেবীর মধ্যেও বৌদ্ধদেবীর প্রভাব বিদ্যমান। এটাকেও সহজে অনেকেই স্বীকার করতে চান না। সত্যকে অস্বীকার করলে ইতিহাসের ধারাকেই অস্বীকার করতে হয়। কারো ভালো লাগুক আব নাই লাগুক, কেউ স্বীকার করুন আর নাই করুন-প্রকৃত সত্য হলো পৌরাণিক ধর্মের আগে বৌদ্ধধর্মে শক্তিতত্ত্বের অনু-প্রবেশ ঘটেছিল এবং অনেক হিন্দুদেবীর ওপর বৌদ্ধদেবীব প্রভাব আছে। পৌরাণিক ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের পূর্বেই বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়েছিল। ভারতেব বাইরে বিশেষত চীন, তিব্বত ও ভূটানে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক হারে প্রসাব ঘটিয়েছিল। গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়াব আগে বৌদ্ধধর্মই রাজধর্ম ছিল। ফলে রাজাব পোষকতায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল। এমন কি পৌরাণিক ধর্ম প্রবর্তনের মূলে আছে বৌদ্ধ অভিঘাত। এটাই হলো ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক সত্য।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম প্রচার শুরু করেন। তখন সমাজের অধিকসংখ্যক মানুষের মধ্যে শক্তি ও তন্ত্রের প্রভাব ছিল। গৌতম বুদ্ধ তাঁর সংঘে নারীদের প্রবেশাধিকার দেননি। কিন্তু তিনি দেখলেন এতে জনপ্রিয়তা বাড়ছে না। তখন তিনি বৌদ্ধসংঘে নারীদের

প্রবেশাধিকার দেন। তখন থেকেই ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু তখনও শক্তিতত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটেনি।

বুদ্ধদেবের ধর্মমত ও বাণী তাঁর জীবনকালেব মধ্যে লিখিত হয়নি। এটা হয়েছিল অনেক পরে। কিন্তু বুদ্ধের ধর্মমত ও বাণী লিপিবদ্ধ না হওয়ার ফলে তাঁর মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্মমত নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যার সূত্রপাত হয়। বুদ্ধদেবের 'নির্বাণ' ও 'করুণা' শব্দ দুটির অর্থ নিয়ে বিবাদ দেখা দেয় এবং নানা শাখার সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে আঠারটি শাখায় বৌদ্ধধর্ম বিভক্ত হয়। পরে আলাপ-আলোচনা ও বিবাদের সূত্র ধরে সমস্ত শাখাগুলি দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়। শাখাদুটির একটির নাম হীনযান অপরটির নাম মহাযান। হীনযান সম্প্রদায় ছিল সংরক্ষণশীল। এরা বুদ্ধদেবের মত ও বাণীর যথাযথ অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল। এদের রচিত গ্রন্থ 'ত্রিপিটক'। মহাযানীরা ছিল সংস্কারবাদী ও উদারমতাবলম্বী। তারা অন্ত্যজ সমাজেব শক্তিপূজা ও তন্ত্রাচার গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মকে নবরূপ দেয়। তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড অনুপ্রবেশেব ফলে মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে বজ্রযান নামে আর একটি শাখার উদ্ভব হয়। ঐ একই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে বজ্রযানের মধ্যেও কালচক্রযান ও সহজযান-এর উদ্ভব হয়। এগুলি বজ্রযানেরই রূপান্তর মাত্র। বজ্রযানারা দেব-দেবীর প্রবর্তন করে এবং শক্তি মন্ত্র, জপ প্রভৃতির প্রচলন করে। এদের বিরুদ্ধে সহজযানীরা তান্ত্রিক যোগাচারের ওপর গুরুত্ব দেয়। তারা তান্ত্রিক পূজার বিরুদ্ধে মত দেয়। এদের কাছে দেব-দেবীর মূল্য ছিল না। কিন্তু এদের মধ্যে শক্তিতন্ত্রের প্রভাব ছিল। মূল শক্তিরূপে চণ্ডালীর বা ডোমনীর স্বীকৃতি এবং দেহতত্ত্বের পরিকল্পনা এদের মধ্যে স্থান পায়। এরা মনে করতো এবং বিশ্বাস করতো যৌনসম্পর্কিত যৌগিক ক্রিয়ায় মহাসুখ লাভ করা যায়। তাদের কাছে এটাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।

বজ্রযান ছিল বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম। শক্তিদেবীর উপাসনা, পূজা-যোগাচার প্রভৃতিকে তারা গুরুত্ব এবং সৃষ্টি করে বিভিন্ন দেব-দেবীর। পণ্ডিতদের মতে বজ্রযানের উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছিল বাংলাদেশে

লোকায়ত তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাবে। বজ্রযানীদের প্রধান চারটি কেন্দ্র ছিল—কামাখ্যা, শ্রীহট্ট, পূর্ণগিরি ও উড্ডীয়ান। চারটি কেন্দ্রেই বজ্র-যোগিনীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বজ্রযানীরাই বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের ও দেব-দেবীর বর্ণনা দিয়ে গ্রন্থ রচনা করে প্রথম। তাদের প্রথম তন্ত্র গ্রন্থের নাম 'গুহ্যসমাজ তন্ত্র'। আরও অসংখ্য তন্ত্র গ্রন্থ (কারো কারো মতে ৭৮টি, কারো কারো মতে আরও অনেক) রচনা করে।

বজ্রযানীদের বৌদ্ধ তন্ত্রে অনেক দেব-দেবীর পূজা ও মন্ত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে। বৌদ্ধ দেব-দেবীরা হলেন—আদিবুদ্ধ, পাঁচটি ধ্যানী বুদ্ধ এবং তাদের শক্তি, যেমন—অক্ষোভ্য বা শক্তিমামকী, অমিতাভ বা শক্তি পাণ্ডরা অমোঘসিদ্ধি বা শক্তি তারা, বৈরচন বা শক্তিলোচনা, রত্ন সম্ভব বা বজ্রধাত্বীশ্বরী, বজ্রসত্ত্বা বা শক্তি বজ্র সত্বাত্মিকা এবং এদের প্রত্যেক কুলের দেব-দেবীগণ। এছাড়া ছয় দিগ্ দেবী, পক্ষরক্ষা দেবী, চার লাস্যাদেবী, চার দ্বার দেবী, চার পশুমুখী দেবী, চার ডাকিনী, চার রশ্মি দেবী, দ্বাদশ ধারিণী দেবী, দ্বাদশ বশিতা, দ্বাদশ ভূমি, দ্বাদশ পারমিতা প্রভৃতি। এছাড়াও অনেক দেবী আছে। দু-একটি বৌদ্ধ দেবীর বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। বৌদ্ধডাকিনীর মূর্তি—

চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণাতু ত্রিনেত্রা এক বক্তিকা।
দংষ্ট্রারৌদ্র করালী চ পঞ্চ মুদ্রাভি ধারিনীম্॥
শবারূঢ়া মুক্ত কেশা প্রত্যালীঢ় পদান্বিতা।
কপাল মালিনী ঘোরা দক্ষিণে ডমরু কতৃকা॥
বামে কপাল খট্বাঙ্গং স্ফুরৎ সংহার বিগ্রহী।

(ডাকার্ণব হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত)

এই মূর্তির সঙ্গে হিন্দু তন্ত্রের চামুণ্ডার সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধ সর্বেশ্বরী হিন্দুর মহেশ্বরী বা পার্বতী বা দুর্গা। বৌদ্ধ দেবী তারার সঙ্গে দশমহা-বিদ্যার তারার, বৌদ্ধ পর্ণশবরীর সঙ্গে হিন্দুদেবী দুর্গার, বৌদ্ধ সাধন-মালায় শক্তিদেবীর মহামায়ুরী—অপরাজিতা—বজ্রবারাহী—ভীমা—কপালিনী—কৌবেরী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপের সঙ্গে মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীর মায়ুরী,

অপরাজিতা, বারাহী, ভীমা, কপালিনী, কৌবেরী নামের, বৌদ্ধতন্ত্রে মহাকালের সঙ্গে যুক্ত। কাল দূতীর সঙ্গে চণ্ডীর শিবদূতীর, বৌদ্ধতন্ত্রের কালিকাদেবীর সঙ্গে দশমহাবিদ্যার কালীর সাদৃশ্য আছে। প্রথমদিকে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব হিন্দু তন্ত্রে পড়েছিল। কিন্তু পরের দিকে কিছু কিছু হিন্দু তন্ত্রের প্রভাব বৌদ্ধতন্ত্রকেও প্রভাবিত করেছিল। তবে বৌদ্ধতন্ত্রের এবং হিন্দুধর্মের তন্ত্রের উৎস এক—সেই আদিম কৌম শক্তিতত্ত্ব ও তান্ত্রিক ক্রিয়া।

॥ ৫ ॥

ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম অতি প্রাচীন। গুপ্ত রাজাদের সময়ে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয়ে হিন্দু ধর্ম নতুন রূপ নিয়েছিল। এই সময় শিবের ভক্তরা শৈব আর বিষ্ণু ভক্তরা বৈষ্ণব নামে অভিহিত হলেন। বৈষ্ণবধর্মে শক্তিবাদের অনুপ্রবেশ অনেক আগেই ঘটলেও চৈতন্য সমকালে এবং চৈতন্যের পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে শক্তিবাদ প্রসার লাভ করেছিল। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ গ্রন্থে বলেছেন—"রাধাবাদের বীজ রহিয়াছে ভারতীয় সাধারণ শক্তিবাদে, সেই সাধারণ শক্তিবাদই বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের সহিত বিভিন্ন ভাবে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে বিচিত্র পরিণতি লাভ করিয়াছ। সেই ক্রম পরিণতির একটি বিশেষ অভিব্যক্তিই রাধাবাদ।" এদেশে দু'ধরনের বৈষ্ণব সাধনার ধারা ছিল মধ্যযুগের প্রারম্ভ কাল থেকেই। একটি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে বিশুদ্ধ প্রেমাশ্রিত ধারা অপরটি তান্ত্রিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত ধারা। বৈষ্ণবদের 'পঞ্চরাত্র' গ্রন্থে শক্তিবাদের সুস্পষ্ট পরিচয় নিহিত আছে। 'গৌতমীয় তন্ত্র' বৈষ্ণবের শক্তি সাধনার আর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। 'রাধাতন্ত্র' গ্রন্থে শক্তি উপাসনার কথা বলা হয়েছে—

কুলাচারং বিনা পুত্র ন হি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
শক্তিহীনস্য তে সিদ্ধিং কথং ভবতি পুত্রক ॥

দেবী বাসুদেবকে বলেছেন তোমার সব বৃথা যাবে, কারণ কুলাচার ছাড়া সিদ্ধিলাভের আশা নেই এবং শক্তির যোগ ছাড়া পূজা নিষ্ফল। রাধা তন্ত্র মতে রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা শক্তির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের মহাবিদ্যার আরাধনা। এই গ্রন্থে দেবী আরও বলেছেন—ভোগ ভিন্ন যোগের মূল্য নেই। শক্তির সাহায্যে যোগ সাধনা করতে হবে। মথুরা ও ব্রজধাম দেবীর কেশ পীঠ। তথায় কাত্যায়নী দেবী বিরাজ করছেন। পদ্মিনীর সঙ্গে কুলাচার পদ্ধতিতে সাধনা করলে সিদ্ধি হবে। এই পদ্মিনীই হলেন রাধা, ইনিই কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। রাধা কৃষ্ণের আনন্দবর্ধিনী। শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে রাধার যে শক্তি রূপিণীত্ব তা বিশুদ্ধ দার্শনিক শক্তির রূপিণীত্ব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ রাধার শক্তিতত্ত্ব প্রতিপন্ন করেছেন—

হ্লাদিনী যা মহা শক্তি সর্বশক্তি বরীয়সী।
তৎসার ভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥
(উজ্জ্বলনীলমণি—রাধাপ্রকরণ)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ কৃষ্ণের সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দকে নিয়ে শক্তির তিনটি ভাগ করেছেন—সত্তা-বিধৃতিকারিণী সন্ধিনী, চৈতন্যদায়িনী সংবিৎ, আনন্দ-বিধায়িত্রী হ্লাদিনী। হ্লাদিনী অপর দুই শক্তির বিকল্প শক্তি নয় বরং এর মধ্যেই অপব দুই শক্তি পূর্ণতা পেয়েছে। হ্লাদিনীর জীবন্ত বিগ্রহ হলেন রাধা। রাধার মধ্যেই সত্তা, চৈতন্য, আনন্দ পরিপূর্ণ-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, চৈতন্যের পূর্বে যে বৈষ্ণব ধর্ম ছিল তার মধ্যে শক্তিবাদের প্রভাব ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিকদের রাধাবাদের মধ্যে তান্ত্রিক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এটা আরও ব্যাপকতা লাভ করে চৈতন্য 'পরবর্তী বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে। শক্তিরূপিণী রাধার একটি বিশেষ রূপ প্রকটিত হয়েছে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মে। সহজিয়াদের সাধনা তন্ত্রসাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে তন্ত্রের যোগ সাধনার সঙ্গে সহজিয়াদের প্রেমের ভাব সাধনা সংপৃক্ত। হিন্দু তন্ত্র সাধনায় আছে অদ্বয় পরম

সত্যের দুটি ধারা—শক্তি এবং শিব। বৌদ্ধ তন্ত্রেও অদ্বয় সত্যের দুটি ধারা আছে—প্রজ্ঞা এবং উপায়। ঠিক তেমনি বৈষ্ণব তন্ত্রেও (সহজিয়াদের) আছে মহাভাবরূপ দুটি ধারা—রস ও রতি। রস হলো কৃষ্ণ আর রতি হলো রাধা। বৌদ্ধ তন্ত্রে সাধনার ভিত্তি হলো নর-নারীব মিলিত সাধনা। নারীতে প্রজ্ঞাভাবনা আর পুরুষে উপায় ভাবনা ও উপায় উপলব্ধি। হিন্দুতন্ত্রে নারীতে শক্তি ভাবনা ও উপলব্ধি আর পুরুষে শিব ভাবনা ও উপলব্ধি। বৈষ্ণবতন্ত্রে মহাভাবের সাধনার প্রধান কথা—রূপের মধ্যে স্বরূপের উপলব্ধি ও প্রতিষ্ঠা। বৈষ্ণব সহজিয়া তন্ত্রে রূপের মধ্যে স্বরূপের অবস্থিতি রাধার আর পুরুষ রূপের স্বরূপে অবস্থিতি কৃষ্ণের। মহাভাবই জীবেব সহজ স্বরূপ। রতিরূপিণী রাধার মধ্যে দেখা যায় শক্তিতন্ত্রের মূল কথা। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর *Obscure Religious Cult*—'গ্রন্থে বলেছেন—"*The psycho physiological yogic processes, frequently refered to in the lyrical songs of the Vaishnava Sahajiyas and also in the innumberable short and long texts, embodying the doctrines of the cult are fundamentally the same as are found in the Hindu Tantras as well as the Buddhist Tantars and the Buddhist songs and Dohas.*" বৈষ্ণব দর্শনে রাগাত্মিকা তত্ত্বে তান্ত্রিক যোগসাধনাব সমস্ত কথাই উল্লিখিত হয়েছে।

পৌরাণিক যুগে লোকায়ত ধর্ম সমন্বয়ের সময়ে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি, বেদান্তের ব্রহ্ম-মায়া, তন্ত্রের শিব-শক্তি, বৈষ্ণবের বিষ্ণু-লক্ষ্মী এবং পরে কৃষ্ণ-রাধাকে গ্রহণ করা হয়েছে একই তত্ত্বর দ্যোতক হিসেবে। বাংলাদেশে অনেক সময় শিব শক্তি এবং রাধা-কৃষ্ণকে এক করে দেখা হয়েছে। একই যুগল মূর্তি ভক্তের ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন যুগল মূর্তি ধরেছেন।

আপনি গোপিনী বেশে বশ হয়্যা কৃষ্ণরসে
রাস কৈলে ব্রহ্মরতিরসে।

বিস্তারিয়া গুণ কোষ কাল্যে মহাপরিতোষ
আত্মারাম আপনার সনে॥
কেহ বলে রাধাশ্যাম, কেহ বলে সীতারাম
কেহ বলে শঙ্কর ভবানী।
ভূতলে ভকত ধন্য যাহার ভজন জন্য
এক মূর্তি অনন্ত রূপিণী॥

(নারায়ণী বন্দনা—সম্পাদিত যোগিলাল হালদার)

হিন্দুতন্ত্রের কালী বা শ্যামার সঙ্গে বৈষ্ণবদের রাধাকে অভেদ কল্পনার তত্ত্ব আরো আছে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব কে বুঝে একথা বিষমভারি॥
নিজতনু আধা গুণবতী রাধা আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি এবে পীত ধটি এলোচুল চূড়া বংশীধারী॥

কিংবা—

কালীঘাটে কালী তুমি কৈলাসে ভবানী
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী গোকুলে গোপিনী

হিন্দুতন্ত্রের শক্তি ও রাধার অভেদ কল্পনা পৌরাণিক যুগেই হয়েছিল। এই তত্ত্ব বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতকে কাব্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে গূঢ় তত্ত্বকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

॥ ৬ ॥

আর্যদের যজুর্বেদে 'ত্র্যম্বক হোম'-এ রুদ্র ভগিনী অম্বিকারূপের মধ্যে শক্তিতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। পরে উপনিষদে ব্রহ্মের শক্তি-রূপে দেবীর আবির্ভাব ঘটে। উপনিষদের আলোচনার আগে অথর্ব

বেদের ব্রাত্য ধর্মের কথা উল্লেখ প্রয়োজন। অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডে ব্রাত্যধর্মের কথা আছে। প্রাগার্য ধর্ম প'রে বিকশিত হয়েছিল তন্ত্রধর্ম। তন্ত্রধর্ম রূপ নিয়েছিল পৌরাণিক যুগে। তার আগে অথর্ব-বেদে প্রাগার্য শক্তিতত্ত্বকে গ্রহণ করে তন্ত্রধর্মের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। অথর্ববেদে বলা হয়েছে—"ব্রাত্য পুরুষ মহানুভব, দেবপ্রিয়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তেজের মূল অধিক কি ব্রাত্য পুরুষ দেবাদিদেব।" এর মধ্যে এমন সমস্ত উপাদান আছে যার অধিকাংশই গৃহীত হয়েছে অনার্য সংস্কৃতি থেকে। অথর্ববেদের কালে আর্য-অনার্যের সংঘাত অনেক কমে এসেছিল এবং ক্রমেই তারা পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছিল। বহু অনার্য রমণীকে তারা স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ফলে তাদের মনের পরিবর্তন হচ্ছিল।

ঋগ্বেদের পৃথিবী সূক্তে পৃথিবীকে মাতা রূপে বর্ণনা করা হলেও তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অথর্ববেদে পৃথিবী সন্তানবৎসলা কল্যাণময়ী মাতৃ-রূপে বর্ণিত হয়েছে। এই পৃথিবীর ভেতর আছে সমুদ্র, জল, অন্ন, কৃষিভূমি—সেইভূমি আমাদের পেয়দান করুক (১২।১।৩)। এই একই সূক্তে বলা হয়েছে—

বিশ্বম্ভরা বাসুযানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশিনী।
বৈশ্বানরং বিভ্রতি ভূমিরগ্নিমন্দ্রি ঋষভা দ্রবিণেনোদধাতু॥
(১২।১।৬)

এই পৃথিবী বিশ্বম্ভরা, বসুন্ধরা—ইহাই প্রতিষ্ঠাস্থল, ইহা সুবর্ণবক্ষা, যাহা কিছু চলমান তাদের নিবেশিনী ; এই ভূমি বৈশ্বানর অগ্নিকে বহন করে ; ইন্দ্র তাহার ঋষভ—এই ভূমি আমাদিগকে সম্পদদান করুক (অনুবাদ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত)।

যৎ তে মধ্যং পৃথিবী যচ্চ নাভ্যং যাস্ত জ স্তনঃ সম্ভূবঃ।
তাস্নো ধেহ্যভিনঃ পবস্ব মাতা ভূমিং পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ॥

হে পৃথিবী, যাহা তোমার মধ্যদেশ, যাহা নাভী, যাহা কিছু বল তোমার দেহ হইতে জাত হইয়াছে—তাহাতেই আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত কর,

আমাদিগকে পবিত্র কর—হে মাতাভূমি, আমি পৃথিবীর সন্তান (অনুবাদ শশিভূষণ দাশগুপ্ত)। এইসব সূক্তে পৃথিবীকে মাতারূপে স্তুত করা হলেও এর মধ্যে শক্তিতত্ত্বের আভাস কোথায়? বরং এগুলিকে শক্তি-তত্ত্বে পৌঁছবার প্রাথমিক স্তর বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ, উপনিষদ এবং পুরাণেও পৃথিবীকে শ্রী, লক্ষ্মী ও মাতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পৃথিবীকে শ্রীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 'নারায়ণোপনিষদে' পৃথিবীর স্তবে পৃথিবীকে শ্রী ও লক্ষ্মী দেবীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
শিরসা ধারয়িষ্যামি রক্ষস্ব মাং পদে পদে॥
ভূমির্ধেনু ধরণী লোকধারিণী।
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা।
মৃত্তিকে হরমে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম॥
মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপে নাভি মন্ত্রি তা।
মৃত্তিকে দেহিমে পুষ্টিং ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
মৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিতে সর্বং তন্মে নির্নুদ মৃত্তিকে।
ত্বয়া হতেন পাপেন গচ্ছামি পরমাং গতিম্॥

যজুর্বেদে যে রুদ্র-ভগিনীর কথা উল্লেখ করেছি (তাঁর উল্লেখ আছে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, শতপথ ব্রাহ্মণে।) তৈত্তিরীয় আরণ্যকে অম্বিকাকে রুদ্রের পত্নী বলা হয়েছে। আবার অম্বিকাকেই শরৎ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় এই শরৎরূপিণী-অম্বিকা পূজাই পরে মহাশক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে শারদীয়া পূজার সৃষ্টি হয়েছে। অম্বিকা পৃথিবী পূজারই নামান্তর। কালিকা পুরাণে পৃথিবীকে জগদ্ধাত্রীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ও পুরাণে পৃথিবী ও মহাশক্তি দুর্গাকে এক করা হয়েছে। দুর্গার মধ্যেও পৃথিবীরূপের পরিচয় নিহিত আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী বলেছেন—

যদারুণাখ্যৈস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রমরং রূপং কৃত্বাহসংখ্যেয়ষট্পদম॥

ত্রৈলোকস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদাস্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ॥

যখন অরুণাসুর ত্রিভুবনে মহা বাধার সৃষ্টি করিবে তখন আমি অসংখ্য ভ্রমর বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্যের হিতের জন্য মহাসুরকে বধ করিব। তখন সকল লোকে আমাকে ভ্রামরী বলিয়া স্তব করিবে (অনু—শশিভূষণ দাশগুপ্ত)। এখানে পৃথিবীই ভ্রামরী। দেখা যাচ্ছে পৃথিবী ভ্রামরীরূপে কল্পিত আবার পৃথিবীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে দেবীও ভ্রামরী হয়েছেন। শস্য উৎপাদনের সঙ্গে দেবীর সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ। দেবী বলেছেন—

ততোহহমখিলং লোকমাত্মদেহ সমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ।
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যামহং ভুবি॥

"হে দেবগণ,অনন্তর-আমি আত্মদেহ সমুদ্ভূত প্রাণধারক শাকসমূহের দ্বারা যতদিন না বৃষ্টি হয় ততদিন পর্যন্ত সমগ্র জগৎ পরিপালন করিব; এই জন্য আমি শাকম্ভরী বলিয়া জগতে বিখ্যাত লাভ করিব" (অনু শশিভূষণ দাশগুপ্ত)। এখানে শাক মানে শস্য। বসুন্ধরাতেই শস্য জন্মে। সুতরাং শাকম্ভরী শস্য উৎপাদনী দেবী। এই দেবীই তো অন্নপূর্ণা। অনেক পরে শাকম্ভরী দেবী অন্নপূর্ণারূপে পূজিতা হয়েছেন। পৃথিবী দেবীকেই কেন্দ্র করে শস্যদেবীর পূজা আরম্ভ হয়েছে। গুপ্তযুগের পরে দেবী পূজার মধ্যে শস্যপূজা মিশে গেছে নানাভাবে। শারদীয়া দুর্গা-পূজাও শস্যপূজারই উন্নতরূপ বা পর্যায়। শরৎকালেই দেবী পূজা হয়। আবার শরৎকালেই শস্যঋতুর আরম্ভ; বিশেষত বাংলাদেশে। আর শস্যঋতুর শেষ বসন্ত কালে। শরৎকাল থেকে বসন্তকালের মধ্যে অনেক দেবী বা শক্তিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, বাসন্তীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা। এই সময়ের মধ্যেই শস্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়। সুতরাং এই সকল দেবী পূজার সঙ্গে শস্যের নিগূঢ় সম্পর্ক।

এখানে স্বভাবতই অনার্য সংস্কৃতির কথা মনে আসে। আর্য সংস্কৃতির

বহুপূর্বেই পৃথিবীকে শস্যপ্রদায়িনী ও প্রাণ প্রদায়িনী রূপে পূজা এবং জগদম্বার মূর্তি গড়ে পূজা প্রচলিত ছিল। প্রথমে আর্যরা যার নিন্দা করেছিল পরে তাকেই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে স্বার্থের খাতিরে (বিষয়টি পূর্বে উল্লেখ করেছি)।

ঋগ্বেদে আমরা রাত্রিসূক্তে দেবীর স্তুতি দেখেছি। (শুক্ল যজুর্বেদেও রাত্রির স্তব আছে (৩৪/৩২)।) অথর্ববেদে কয়েকটি সূক্তে রাত্রিকে দেবী রূপে স্তব করা হয়েছে। যেমন—

যাং দেবাঃ প্রতি নন্দন্তি রাত্রিং ধেনুমু পায়তীং।
সংবৎসরস্য যা পত্নী সা নো অস্তুসুমঙ্গলী ॥ (৩/১০/২)

১৯/৪৭/১-২, ১৯/৪৯/১, ৪, ৮ প্রভৃতি সূক্তেও রাত্রির স্তব আছে। তবে ঋগ্বেদে রাত্রিকে যেভাবে দেবী বলা হয়েছে এখানে সেভাবে দেবী বলা হয়নি। (সামবেদের একটি সূক্তে রাত্রিদেবীব বর্ণনা আছে।) এই বর্ণনায় রাত্রিকে প্রাণীদের সুখপ্রদায়িনী ও সমস্ত কৌমারী শক্তির প্রতীক বলা হয়েছে—

ওঁ রাত্রিং প্রপদ্যে পুনর্ভুং ময়োভুং কন্যাং
শিখণ্ডিনীং পাশিহস্তাং যুবতীং কুমারিণীম।

দেবী পুরাণেও রাত্রিদেবীর স্তুতি আছে।

ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিঃ পরমেশলয়াত্মিকা।
তদধিষ্ঠাতৃদেবী তু ভুবনেশী প্রকীর্তিতা ॥

এখানে রাত্রিকে ব্রহ্মমায়াত্মিকা ও পরমেশলয়াত্মিকা বলা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে ভুবনেশ্বরী বলা হয়েছে। দেবী পুরাণে আবার রাত্রিকেই শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

দিবসোঽহহং বরারোহে রজনী ত্বং নিগদ্যসে।
দিবসোঽহং মুহূর্তশ্চ ত্বং সন্ধ্যাকাল এব চ ॥

মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীতেও রাত্রিকে 'কালরাত্রি', 'মহারাত্রি' বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে অগ্নিকে শক্তির উৎস বলা হয়েছে—

বি পাজসা পৃথুলাশোশু চানো
বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমী বাঃ।
সুশমর্ণো বৃহতঃ শর্মাণি
স্যামগ্নেরহং সুহবস্য প্রণাতৌ॥ (৩।১৫।১)

হে অগ্নি! তুমি বিস্তীর্ণ তেজঃ দ্বারা অত্যন্ত দীপ্তমান, তুমি শত্রুদিগকে এবং রোগরহিত রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর, অগ্নি উৎকৃষ্ট সুখপ্রদ, মহান এবং উত্তম আহ্বানযুক্ত। আমি তাঁহারই রক্ষণে থাকিব (অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত)। এই সূক্তের পরবর্তী কালের ব্যাখ্যাকারেরা বলেছেন যজ্ঞাগ্নি হলেন দুর্গার আদিরূপ। অসুরনাশিনী দুর্গা হলেন অগ্নিরূপিণী। নারায়ণী উপনিষদেও একই কথা বলা হয়েছে। মুণ্ডক্য উপনিষদে অগ্নির সাতটি শিখা কালী, করালী প্রভৃতি বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে অগ্নিকেই মহাশক্তির আধারভূতা বলা হয়েছে। দেবী পুরাণেও দেখি কুণ্ডস্থা বহ্নিকে দেবী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনিই সর্বোত্তমা—

সর্বেষামেব দেবানাং কথিতা দেবী চোত্তম।
বিশেষণে তু বহ্নিস্থাআয়ুরারোগ্যদামতা॥

পুরাণের কালে রাত্রি ও অগ্নিকে দেবীর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলিই দেবী বা কালী এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। হীনমণ্যতা থেকে সত্যকে অস্বীকার করবার চেষ্টা হয়েছে। অনার্য শব্দ আমরা অনায়াসে ব্যবহার করি। এমন কি অনেক অনার্য সংস্কারও বিনা দ্বিধায় মেনে নিই। কিন্তু দেব-দেবীর কল্পনা অনার্যদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে এটা মানতে অনেকই চান না। কিন্তু না চাইলেও উপায় নেই। আর্য আগমনের বহুপূর্বেই শিব-শক্তির চিন্তা ও উপাসনা এদেশে ছিল। পরবর্তী কালে পুরাণের যুগে বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্র গ্রন্থ রচনার সময় অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে আরও বহুধারা এসে মিশেছে। রাত্রিসূক্ত থেকে দুর্গা বা কালী এবং যজ্ঞাগ্নি থেকে দুর্গার আবির্ভাব হয়েছে ইতিহাসের বিচারে এবং সমাজতত্ত্বের বিচারে এটা প্রমাণ করা যায় না।

এই ধরনের উক্তি শুধু অযৌক্তিক নয়, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং জনমনকে বিভ্রান্ত করা।

॥ ৭ ॥

দেবীরূপের একটি স্পষ্ট চিত্র আর্যগ্রন্থ অথর্ববেদের মধ্যেই প্রথম পাওয়া যায়।

সিংহে ব্যাঘ্রে উত যা পৃদাকৌ
ত্বিষিরগ্নৌ ব্রাহ্মণে সূর্যেষা।
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান
সান ঐতুবর্চসা সংবিদানা॥
যাহস্তিনি দ্বীপিনি যা হিরণ্যে
ত্বিষির পস্সু গোষু যা পুরুষেষু।
ইন্দ্রং যা দেবী……
রথে অক্ষেষ্বৃষভস্য বাজে
বাতে পর্জন্যে বরুণস্য শুষ্মে।
ইন্দ্রং যা দেবী……
রাজন্যে দুন্দুভাবায় তাযা
মশ্বস্য বাজে পুরুষস্য মায়ৌ।
ইন্দ্রং যা দেবী……৬।৩৮।১, ২, ৩, ৪

যিনি সিংহে ব্যাঘ্রে এবং সর্পের ভিতরে—দীপ্তি যিনি অগ্নিতে, ব্রাহ্মণে, সূর্যে; ইন্দ্রকে যিনি জন্ম দিয়াছেন যে সুভগাদেবী, তেজোদীপ্তা সেই দেবী আমাদের নিকটে আসুন। যিনি হস্তীতে দীপিতে, যিনি হিরণ্যেদীপ্তি যিনি জলরাশিতে, গোসমূহে, পুরুষসমূহে; ইন্দ্রকে জন্ম দিয়াছেন …যিনি রথসমূহে, অক্ষসমূহে, ঋষভের শক্তিতে; যিনি বায়ুতে, পর্জন্যে বরুণের শক্তিতে; ইন্দ্রকে জন্ম দিয়াছেন…। যিনি রাজন্যে দুন্দুভিতে, অশ্বের গতিতে পুরুষের গর্জনে ইন্দ্রকে জন্ম দিয়াছেন….(অনুবাদ শশিভূষণ দাশগুপ্ত)।

অথর্ববেদের এই সূক্তে দেবীকে প্রকৃত শক্তিময়ীরূপে পাওয়া যায়। এই দেবীই রূপান্তরিত হয়ে 'কেন উপনিষদে' উমা-হৈমবতীরূপে আবির্ভূতা হয়েছেন ইন্দ্রের সম্মুখে এবং ব্রহ্মের শক্তি ও মহিমা বর্ণনা করেছেন। উমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী, ব্রহ্মজ্যোতিরূপিণী আদি শক্তি। তিনিই দেবতাগণকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করেছেন। উপনিষদে ব্রহ্মের শক্তিরূপে উমা-হৈমবতীর আবির্ভাব।

ইন্দ্রের সম্মুখে উমা-হৈমবতীর আবির্ভাবের একটি কাহিনী আছে। কাহিনীটি হলো—দেবাসুর যুদ্ধে দেবতারা জয়ী হলেন। কিন্তু এই জয়ের মূলে ছিলেন ব্রহ্মা। দেবতারা সেটা ভুলে গেলেন। তখন ব্রহ্মা দেবতাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের সামনে আবির্ভূত হন। দেবতারা বুঝতে না পেরে অগ্নিকে পাঠায়। অগ্নি তার পরীক্ষায় সফল হলো না। তারপর বায়ুকে পাঠান হলো। বায়ুও ব্যর্থ হলো। তারপর ইন্দ্র গেলে দেখতে পায় স্ত্রীমূর্তি। সেই স্ত্রীমূর্তির হলেন উমা-হৈমবতী। উমার আর একটি নাম পার্বতী। উপনিষদ গ্রন্থগুলিতে আর উমার উল্লেখ নেই। বৈদিক যুগের শেষ দিকে বিভিন্ন উপনিষদে কালী-করালী, ভবানী, দুর্গা প্রভৃতির নাম পাই। রুদ্রপত্নী রূপে অম্বিকা, অগ্নিশিখারূপে কালী-করালী, ব্রহ্মার শক্তি রূপে উমা-হৈমবতী। মনে হয় উমা-হৈমবতী ছাড়া অপর সকলে অপ্রধান দেবী ছিলেন। পরে সকলেই পার্বতী-দুর্গার সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছেন। যদিও উল্লিখিত দেবীদের মূর্তিও কোথাও কোথাও পূজা করা হয়। প্রথম দিকে অপ্রধান থাকলেও পরে এক মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে নামগুলি একই মহাদেবীর বিভিন্ন প্রকাশ হয়ে গিয়েছে।

এখানে একটি কথা মনে আসতে পারে উমা বা পার্বতী নামটি কেন হলো? মনে হয় হিমবৎ পর্বতের কন্যা হলেন হৈমবতী। এই হৈমবতীর সঙ্গে উমার নাম যুক্ত হওয়ায় মনে হয় 'কেন উপনিষদে'র রচয়িতার কাছে উমা নামে কোন দেবীর প্রসিদ্ধি ছিল। শশিভূষণ দাশগুপ্তও এই মতটি পোষণ করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক লৌকিক দেবীর অস্তিত্ব

তখনও যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। তাছাড়া উপনিষদগুলি সম্ভবত হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে রচিত হয়েছিল। পার্বত্য অঞ্চলের কোন লৌকিক দেবীর নাম ছিল উমা। 'কেন উপনিষদে'র রচয়িতা মহাশক্তির উল্লেখের সময় তাঁর পরিচিত নামটিই ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের ঘটনা যুক্তিসঙ্গত। সমাজতত্ত্বের বিচারে এ রকমটা হওয়াই স্বাভাবিক। পার্বতী নামটিও এইভাবে এসেছে। অর্থাৎ তিনি পর্বতের অধিবাসী। আঞ্চলিক মানুষের কাছে তিনি পার্বতী নামে অভিহীত হয়েছেন। পার্বতী-উমা কখনো কৈলাস বাসিনী, কখনো বিন্ধ্যবাসিনী। পরে দেখব চণ্ডী নিজেই বলেছেন তিনি বিন্ধ্যবাসিনী। পার্বতী-উমাকে দুর্গা চণ্ডীর দেহে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর আরও নাম আছে—গিরি রাজার কন্যা হিসেবে উমা, কাত্যায়নীর কন্যা হিসেবে কাত্যায়নী, জহ্নু মুনির কন্যা হিসেবে জাহ্নবী নামে এবং বিন্ধ অঞ্চলে কুমারী ও দাক্ষিণাত্যে কুমারী নামে প্রসিদ্ধা।

॥ ৮ ॥

পুরাণে মাতৃভাবের প্রসার সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যেমন পুরাণের প্রধান দেবতা, তেমনি পুরাণের প্রধান দেবী শক্তিদেবী। তাঁর একচ্ছত্র প্রভাব সর্বত্রই। দেবী ভাগবতে, মার্কেণ্ডেয় পুরাণে এবং কালিকা পুরাণে দেবী সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর পরিচয়ের অন্ত নেই। এক এক সময় এক এক রকম তাঁর পরিচয় এবং নাম। ব্রহ্মার শক্তিরূপে ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুর শক্তিরূপে তিনি বৈষ্ণবী শক্তি আবার শিবশক্তি রূপে তিনি শিবানী। তবে শিব শক্তিরূপেই তাঁর পরিচয় পরিব্যাপ্ত। উমা-পার্বতী-চণ্ডী-দুর্গা-কালী-করালী সকল রূপেই তিনি শিবশক্তি রূপে বিরাজমানা। কখনো তিনি কন্যা, কখনো মা, কখনো অসুরনাশিনী, কখনো কল্যাণময়ী। কখনো ভয়ংকর, কখনো মধুর। তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের প্রতীক। পুরাণে আবার দেখা

যায় সত্ত্ব, রজ, তমগুণের প্রতীক হিসেবে যথাক্রমে সরস্বতী, লক্ষ্মী এবং কালী। আবার অন্যত্র দেখা যায় লক্ষ্মী সরস্বতী তাঁর কন্যা।

দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ, বিষ্ণু কর্তৃক সতীর দেহচ্ছেদ এবং একান্ন-স্থানে সতীর দেহের বিভিন্ন টুকরোর পতনকে কেন্দ্র করে একান্নপীঠের এবং তীর্থস্থানের প্রবর্তন প্রভৃতি ঘটনা, দেবীর দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ প্রভৃতি ঘটনা অর্বাচীন পৌরাণিক কাহিনী। চামুণ্ডাতন্ত্র, মহাভাগবত পুরাণ, কুব্জিকাতন্ত্র, নারদপঞ্চরাত্র, তোড়নতন্ত্র, মহানির্বাণতন্ত্র, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, তন্ত্রচূড়ামণি ও কালী পুরাণে উল্লিখিত বিষয়গুলি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ সবই অর্বাচীন কালের রচনা। ঋগ্বেদের অদিতি দেবীই পৃথিবী দেবীতে রূপান্তরিত হয়ে পরে অনার্য দেবীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মহাদেবীতে পরিণত হয়েছেন।

পূর্বে যে পার্বতী-উমার উল্লেখ করা হয়েছে সেই পার্বতী-উমাই পরে দুর্গা নামে প্রসিদ্ধা হয়েছেন। দুর্গার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় তৈত্তরীয় আরণ্যকে যাজ্ঞিকা অংশে। ঐ একই আরণ্যকের নারায়ণ উপনিষদে আছে—

তামাগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ॥

দুর্গা হলেন দুর্গতিনাশিনী। সেইজন্যে মানুষ তাঁর স্মরণ করেন। প্রথম দিকে দুর্গা নামের উৎপত্তি হয়েছিল দুর্গরক্ষাকারিণী রূপে। দুর্গ রক্ষা-কারিণী দেবী হলেন দুর্গা। এটি অনেক পণ্ডিতের অভিমত। তাঁরা দুর্গা নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইভাবেই করেছেন। তাঁদের মতের সমর্থন পাওয়া যায় দেবী পুরাণে, দেবীভাগবতে, খিল হরিবংশে। এইসব গ্রন্থে দুর্গাকে দুর্গরক্ষাকারিণী রূপে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দু-একটি উদাহরণ দিয়ে মতটির সত্যতা প্রমাণ করা যাক—

ত্বং হি তুর্গে মহাবীর্যে তুর্গে তুর্গাপরাক্রমে।
সকলো নিষ্কলশ্চৈব কলাতীত নমোঽস্তুতে॥
যোগধিপো যোগগম্যো যোগাত্মা যোগসম্ভবঃ।
রমসে দেবী তুর্গেষু তুর্গেশ্বরি নমোঽস্তুতে॥ ৮৩।৬২-৬৩

(দেবীপুরাণ)

এবং স্তুতী মহাদেবী তুর্গাতুর্গ পরাক্রমা
সান্নিধ্যং কল্পায়ামাস অনিরুদ্ধস্য বন্ধনে॥ ১২০.৩৫

(খিল হরিবংশ)

নগরে হত্র ত্বয়া মাতঃ স্থাতব্যং মম সর্বদা।
তুর্গা দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শক্তিরিহ সংস্থিতা॥
রক্ষা ত্বয়া চ কর্তব্যা সর্বদা নগরস্য হ।
যথা সুদর্শনস্ত্রাতো রিপুসঙ্ঘাদনাময়ঃ॥ ৩।২৪।৫৬

(দেবীভাগবত)

দেখা যাচ্ছে তুর্গা প্রথমে তুর্গরক্ষাকারিণী দেবী ছিলেন। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করবার আগে তুর্গা নামটির ব্যবহারের আরও তুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একটি মার্কেণ্ডেয় চণ্ডী থেকে অপরটি শব্দ কল্পদ্রুম থেকে।

মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীতে একবার বলা হয়েছে, তুর্গম ভবসাগর পার করবার জন্যেই তুর্গার আবির্ভাব। অর্থাৎ তুর্গা ভবসাগরের নৌকোস্বরূপ। পরে অন্যত্র বলা হয়েছে—তুর্গম নামে এক অসুরকে বধ করবেন বলেই দেবী তুর্গা নামে খ্যাতি পাবেন—

তত্রৈব চ বধিষ্যামি তুর্গমাখ্যং মহাসুরম।
তুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥ ১১/৪৯,৫০

শব্দকল্পদ্রুমে তুর্গা নামের অনেক অর্থ বলা হয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস এবং সংস্কারের ওপর নির্ভর করেই এইসব অর্থ তুর্গা নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। যেমন—

তুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্মণি।
শোকে তুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥

মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা ॥

অর্থাৎ দুর্গ নামক দৈত্য, মহবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, মহাভয়, অতিরোগ প্রভৃতি যিনি দমন বা হনন করতে পারেন তিনি দুর্গা নামে পরিকীর্তিতা। এসব ব্যাখ্যা যে প্রচলিত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে রচিত তা বলা বাহুল্য মাত্র।

উমাকে পাওয়া যায় প্রথমে কন্যারূপে, পরে পত্নী ও ঘোরতর সংসারী রূপে। কিন্তু দুর্গাকে পাওয়া যায় অস্ত্রশস্ত্রধারিণী অসুরনাশিনী বা দুর্গরক্ষাকারিণী রূপে। পরে পাওয়া যায় অসুরনাশিনী দশভূজা চণ্ডীরূপে, তারপরে চতুর্ভুজা নরমুণ্ডমালাবিভূষিতা কালী রূপে। আধুনিক কালে যেমন কাউকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা-আরতি করা হয় ঠিক তেমনি ঘটনাই অতীতে ঘটেছিল। দেবীর বিবর্তনের ইতিহাসের একেবারে আদিরূপের কথা বাদ দিলে (সিন্ধু সভ্যতার যে মূর্তি পাওয়া গেছে) পরের দিকে কোন কোন অসাধারণ গুণসম্পন্না ও বীরাঙ্গনা নারীকে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে এরকম হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে এরকম কোন নারীকে দেবী বলা হয়েছিল। আর এসবই হয়েছিল অনার্যদের মধ্যে। এইসব মানবী তথা দেবী পরবর্তী কালে আর্যসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যেমন পূর্বে উল্লিখিত উমার নাম কেন উপনিষদে দেখতে পাওয়া যায়। এই উমা নামে কোন প্রাচীন দেবী কেন উপনিষদের রচয়িতার জানা ছিল। কিন্তু এই উমা সত্যি সত্যি আকাশ থেকে পড়েননি। কোন নারীকে আদিবাসীরা দেবীরূপে পূজা করতো তাঁর কোন গুণের জন্যে। তাঁর মৃত্যুর পর দেবীত্ব হয়তো আরো প্রচার পেয়েছিল। পার্বতী ও দুর্গার সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। দেবী পুরাণে, দেবী ভাগবতে, খিল হরিবংশে দুর্গাকে দুর্গরক্ষাকারিণী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মনে হয় অনার্যদের মধ্যে এমন কোন নারী ছিলেন যিনি বিপদে-আপদে সর্বদাই সকলকে সাহায্য করতেন। আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের সংঘাত তো

ঐতিহাসিক সত্য। এই রকম কোন সংঘাতের কালে কোন নারী অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে অনার্যদের দুর্গ রক্ষা করেছিলেন। বিপদ কেটে গেলে সেই নারীকেই সসম্মানে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পরে যে কালীর কথা বলবো তাঁরাও একইভাবে পূজিতা হয়েছেন। নরমাংসের মানুষ ছিলেন সকলেই। বিশেষ বিশেষ কারণে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে এক এক জন খ্যাতি অর্জন করে দেবীরূপ লাভ করেছেন এবং এক এক অঞ্চলে এক এক জনের ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়েছে। প্রতিটি দেবীর ধারাই ছিল ভিন্ন ভিন্ন। পৌরাণিক যুগে সকল ধারাকে একত্র করে মহাশক্তির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

॥ ৯ ॥

আর্য সমাজে চণ্ডীদেবীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে মার্কেণ্ডেয় পুরাণকে কেন্দ্র করে। এই গ্রন্থে দেবীর অনেক নাম পাওয়া যায়। দেবী ভগবতী, পরমেশ্বী, চণ্ডিকা অম্বিকা, দুর্গা, গৌরী, কাত্যায়নী, শিবদূতী, শাকম্ভরী, ভীমা, পার্বতী, ভ্রামরী প্রভৃতি নামগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন দেবীর নাম। কখনো বা একই দেবীকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। উমা-পার্বতী-দুর্গা-চণ্ডী প্রভৃতি ধারা স্বতন্ত্র ধারা। মার্কেণ্ডেয় গ্রন্থে দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। যে প্রসিদ্ধ চণ্ডী পাঠ সকলেরই জানা সেই চণ্ডী গ্রন্থটি মার্কেণ্ডেয় পুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চণ্ডী গ্রন্থে দেখি দেবীর সাহায্যে প্রথমে বিষ্ণু মধুকৈটভ অসুরদ্বয়কে হত্যা করা—দ্বিতীয়বার দেখি দেবী মহিষাসুর নামে এক ভয়ঙ্কর অসুরকে বধ করেছেন—তৃতীয়বার দেখি শুম্ভ-নিশুম্ভ অশুরদের বধ করেছেন। মহিষাসুর বধের সময় দেবতাগণ নিজ নিজ অস্ত্র দেবীকে দিয়েছেন। দেবী হলেন দশভূজা। দেবী হলেন

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুসণ্ডী পরিঘায়ুধা

দেবী সৃষ্টি-স্থিতি সংহারকারিণী আবার সৃষ্টি, শাস্তি, ক্ষান্তি, তুষ্টি, শ্রী, বুদ্ধির প্রতীক। এই জ্যোতির্ময়ী তেজোদীপ্তা, দেবী হলেন মহিষমর্দিনী মহাশক্তি। দেবীর এই মহিষমর্দিনী রূপই সমধিক প্রচারিত এবং জনপ্রিয়। শারদীয়া পূজায় এই রূপটি গৃহীত হয়েছে।

যে দেবীকে শক্তি ও পরতত্ত্বের আধার এবং সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কর্তা বলা হয়েছে সেই দেবী কি একসময় রক্ত মাংসের মানুষ ছিলেন? গুরু-গোবিন্দ সিংহের 'চণ্ডীচরিত্র' গ্রন্থে পাওয়া যায় চণ্ডী উজ্জয়িনীর রাজকন্যা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই সিংহাসনে বসে রাজ্য পরিচালনা করেন। নারী হলেও চণ্ডী ছিলেন বীরাঙ্গনা। তাঁর শৌর্য ও বীর্যের কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। একদিন অসুরগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ইন্দ্র চণ্ডীর নিকটে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। চণ্ডী ইন্দ্রকে সাহায্য করার জন্যে অসুর বধের নিমিত্ত বাঘের পিঠে চেপে যুদ্ধ যাত্রা করলেন (এখানে উল্লেখ্য চণ্ডীর বাহন সিংহ এটি প্রচলিত এবং গৃহীত। কিন্তু গুজরাটের জুনাগড়ের দেবী এবং মহারাষ্ট্রের তুলজাপুরের দেবীর বাহন হলো ব্যাঘ্র)।

এই কাহিনীর সত্য-মিথ্যা জানবার উপায় নেই। তবে এই লৌকিক কাহিনী সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। চণ্ডী নিজেই বলেছেন তিনি বিন্ধ্য-বাসিনী। তিনি শবর, পুলিন্দদের পূজিতা। উজ্জয়িনী বিন্ধ্য অঞ্চলেই অবস্থিত। চণ্ডী হয়তো কোন অনার্য রাজ্যের রাজকন্যা ছিলেন। গুরু গোবিন্দের মতানুসারে তিনি উজ্জয়িনীর রাজকন্যা। দেবী যে অনার্য সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। আবার এও হতে পারে চণ্ডী নামে কোন নারী কোন অনার্যগোষ্ঠী প্রধানের কন্যা ছিলেন। আবার হয়তো এই দুটোর কোনটাই সত্য নয়। চণ্ডী নামে কোন নারী অনার্য রমণীদের মধ্যে ছিল। সেই রমণী শিকারে ও শত্রু বিনাশে পারদর্শিনী ছিলেন। যুদ্ধ-সংঘর্ষ প্রভৃতির প্রতি তার একটা আকর্ষণ ছিল। যে গোষ্ঠীর সঙ্গে চণ্ডী যুক্ত ছিল সেই গোষ্ঠীকে বহু বিপদ থেকে চণ্ডী রক্ষা করেছিল। তারই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ চণ্ডীকে পরে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

চণ্ডী রাজকন্যাই হোন বা গোষ্ঠী প্রধানের কন্যাই হোন বা কোন গৃহস্থ রমণীই হোন তিনি যে রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যদিও সবটাই অনুমান নির্ভর। তবু অবাস্তব অনুমানে আর বাস্তব অনুমানের মধ্যে পার্থক্য আছে। বর্তমানে কালের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই উক্ত অনুমান যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হবে। প্রাচীন কাল থেকেই প্রাকৃতিক অবস্থার বিভিন্ন প্রকাশকে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে না পেরে দেব-দেবীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। আবার কোন প্রাকৃতিক ঘটনা বা বিজ্ঞানের প্রকাশের উপকারিতা দেখে তাকে দেব-দেবীর আসনে বসানো হয়েছে। এরই সঙ্গে পরবর্তী কালে কোন কোন নর-নারীর অসাধারণ শক্তি ও গুণ দেখে তাকেও দেব-দেবীর সম্মান দেওয়া অসম্ভব ঘটনা হতে পারে না।

চণ্ডী বা দুর্গা শিকারে প্রিয় এবং সমরে পারদর্শিনী। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ভির্গো (*Virgo*) নামে এক দেবী প্রসিদ্ধা ছিলেন। ইনিও সমরে পটু ছিলেন। এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ মন্-খের জাতিকে পরাজিত করেছিল। মন্-খেররা একটা মিশ্র জাতি। এদের রক্তে সম্ভবত অষ্ট্রোলাড, অ্যাপাইন এবং ক্যাস্পিয়ান জাতির রক্তের মিশ্রণ ঘটেছিল। মহিষ ছিল এদের টোটেম বিশ্বাসের প্রতীক। ফলে মহিষ ছিল তাদের কাছে পবিত্র। মন্-খের মর্দনকেই বলা হয়েছে মহিষমর্দন। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের যুদ্ধের দেবী ছিলেন ভির্গো। তাঁরই নেতৃত্বে মন্-খের মর্দন বা মহিষমর্দন হয়েছিল। দুর্গার মুর্তি কল্পনার মধ্যে তাই মহিষমর্দিনী রূপ স্থান পেয়েছে। তার সঙ্গে আরও অনেক ধারা যুক্ত হয়েছে (এই বিষয়টি 'দুর্গাপূজা' নামে একটি পত্রে দুর্গাদাস পাত্র উল্লেখ করেছিলেন ২৫।১০।৫৯ সালের হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায়)। উক্ত তথ্যটি অনেকেই স্বীকার করেন নি। কিন্তু পত্র লেখক তথ্য সহকারে বিষয়টির ওপর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যাইহোক সম্ভবত বিন্ধ্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের অধিবাসীদের যোগ ছিল নতুবা ঐ অঞ্চলের মানুষের একটা দল বিন্ধ্য অঞ্চলে এসে বসবাস

শুরু করেছিল। ফলে দুই অঞ্চলের সংস্কৃতির সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। দুর্গার রূপের সঙ্গে এই ব্যাখ্যা যদি কেউ স্বীকার নাও করেন তবু মেনে নিতেই হবে যে, বিন্ধ্য অঞ্চলের কোন রক্তমাংসের রমণী এমন এক গোষ্ঠীকে পরাজিত করেছিল যাদের কাছে মহিষ ছিল পবিত্র। (যেমন বৈদিক আর্যরা গোমাংস ভক্ষণ করতো পরে গরুকে তারা পবিত্র মনে করে গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছিল।)

দুর্গা-চণ্ডী প্রভৃতি অনার্য দেবীদের আর্য ধর্মে গ্রহণ করবার পর তাদের নিয়ে অনেক দার্শনিক ব্যাখ্যা গড়ে উঠেছিল। দেবীকে মহা-দেবী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনো তাঁকে শিবের শক্তি রূপে কল্পনা করা হয়েছে, কখনো শিব ও শক্তিকে সমান বলা হয়েছে, আবার কখনো দেবীকে পরম তত্ত্ব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি হলেন মহা শক্তি-রূপিণী। তিনি জগতের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য দেব-গণকে এই মহাশক্তিই শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছেন এবং তাদের মহিমা প্রকাশে সাহায্য করেছেন। দেবী জগতের অধিশ্বরী, জীবগণের অধিশ্বরী, অন্য দেব-দেবীদের অধিশ্বরী, ব্রহ্মস্বরূপিণী। 'চণ্ডীর' একস্থানে দেবী নিজেই বলেছেন—

এরকৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা
পশ্যৈতা দুষ্ট মহয্যেব বিশন্ত্যো মদ্ বিভূতঃ॥

অর্থাৎ জগতে আমি একাই, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। অন্য দেব-দেবীরা আমার বিভূতি মাত্র। নিশুম্ভ নামে অসুর মৃত্যুর আগে দেবীকে বলেছিল তুমি অন্যের শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করেছ। তারই উত্তরে দেবী এই উক্তিটি করেছেন। দেবতাগণ দেবীব স্তবে বলেছেন—

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥

দেখা যাচ্ছে অনার্য এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর দেবীকেই আর্যরা গ্রহণ করে

তার ওপর পরম তত্ত্ব আরোপ করেছে। এর মধ্যে দুই সভ্যতার সমন্বয় ঘটলেও অনার্য সংস্কৃতির শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে।

দুর্গা-চণ্ডী আর্যায়িত হওয়ার পর তাঁর চেহারার পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁর চেহারার মধ্যে আর সেই অনার্য গন্ধ নেই। শুধুমাত্র যুদ্ধের রূপটি আছে। এই রূপটিও পরিমার্জিত হয়েছে। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে দেবী যদি অনার্যই হবেন তাহলে তাঁকে কেন অসুরবধ রূপিণী করা হয়েছে? খুবই যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন। এর উত্তরে বলা যায় আর্য-অনার্যের সমন্বয় ঘটেছিল বৌদ্ধধর্মের অভিঘাতের ফলে (আগে উল্লেখ করেছি)। বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একত্র করবার প্রয়াসে অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে যেমন বাধ্য হয়েছিল আর্যরা তেমনি অনার্য রমণী বিবাহ করবার ফলে তাদের মনেরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল (এটিও আগে উল্লেখ করেছি)। অনার্যদেবী গ্রহণ করা হয়েছে আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়ে। এতো গেল এক দিকের কথা। অন্য দিক দিয়ে বিচার করলে ধরে নেওয়া যায় দেবী অনার্য হলেও যুদ্ধ করেছিল অন্য আর এক অনার্যগোষ্ঠীর সঙ্গে। আর্যরা অনার্যদের অসুর বলতো। হয়তো এমন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল যাদের সঙ্গে আর্যদের শত্রুতা ছিল বেশি এবং যাদের বশে আনতে বা বিনাশ করতে আর্যরা ব্যর্থ হয়েছিল। সুতরাং সমন্বয়ের কালে অসুরনাশিনী রূপটিই যথাযথভাবে গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া আর্য ব্রাহ্মণরাই পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের স্রষ্টা। সুতরাং অনার্য দেবীকে আর্য দেবতামণ্ডলীর মধ্যে স্থান দিলেও অনার্যদের হীন প্রতিপন্ন করবার জন্যেই অসুরনাশিনী রূপ দেওয়া হয়েছে এমন কথাও কেউ কেউ বলে থাকেন। কিন্তু এ ব্যাপারে এ ধরনের চিন্তা সঠিক নয়।

॥ ১০ ॥

আদি মাতার রূপ ও পরিচয় কালী-শ্যামার মধ্যে সুস্পষ্ট। মহাদেবীর বিবর্তনের ইতিহাসে কালীর ধারাটিও এসে মিলিত হয়েছে দেবীর

আর্যায়িত হওয়ার সময়ে। শক্তিদেবী কালীর সাধনা ও পূজা ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত থাকলেও বাংলাদেশের সঙ্গেই তার নাড়ীর সম্পর্ক। বাংলাদেশ শক্তি সাধনাব পীঠস্থান। দশ-মহাবিদ্যার রূপ কল্পনাও বাংলাদেশেই হয়েছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে শক্তির উপাসনা ছিল। পরে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের কালেও বৌদ্ধতন্ত্র ও বৌদ্ধদেবী বাংলা দেশেও প্রচার লাভ করেছিল। আদিম চিন্তার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের চিন্তার মিলনও ঘটেছিল। অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক দেবী শক্তিরূপে পূজিতা হতেন।

অনেকের মতে ঋগ্বেদে এবং অথর্ববেদে যে রাত্রিদেবীর স্তুতি আছে (আগে সূক্তগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছি) সেই রাত্রিদেবীই পরবর্তী সময়ে কালীরূপে বিবর্তিতা হয়েছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে নিঋ্‌তি দেবীর উল্লেখ আছে সেই দেবীকেও কালীর পূর্বরূপ বলে কেউ কেউ মনে করেন। শত পথ ব্রাহ্মণে দেবীকে যথাক্রমে কৃষ্ণা ও ঘোরা বলা হয়েছে—"কৃষ্ণং হি তত্তম আসীদথ কৃষ্ণা বৈ নিঋ্‌তিঃ"(৭।২।৭) এবং "ঘোরা বৈ নিঋ্‌তিঃ" (৭।২।১১)। কালীর পরবর্তী কালের রূপের বর্ণনার মধ্যেও এই দুটি শব্দ 'কৃষ্ণা' ও 'ঘোরা' স্থান পেয়েছে। রাত্রিদেবী বা নিঋ্‌তিঃ দেবীর রূপের সঙ্গে কালীর রূপের সাদৃশ্য থাকলেও এখান থেকেই কালীর ধারণা জন্মেছিল এমন কথা বলা চলে না। এ ধরনের চিন্তার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই। পরে আমরা দেখবো কালী অনার্য দেবী। এই অনার্য দেবীই পৌরাণিক যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। মুণ্ডক উপনিষদের একটি গ্রন্থে প্রথম কালী-করালী শব্দ পাওয়া যায়। মুণ্ডক উপনিষদে কালী-করালী নামটি পাওয়া গেলেও সেখানে মাতৃদেবী হিসেবে তার কোন পরিচয় বিদ্ধৃত হয়নি। মুণ্ডক উপনিষদে কালী-করালী উচ্চারিত হয়েছে যজ্ঞের সপ্ত জিহ্বার একটি জিহ্বা হিসেবে—

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।

স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচি চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বায় ॥

(খিল হরিবংশে আছে)কালীদেবী শবর, পুলিন্দ কর্তৃক পুজিতা হতেন। এখানে আরও বলা হয়েছে(দেবী ছিলেন মদ্যমাংস প্রিয়।)কালীর রূপের বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভুষিতাম্॥
সদ্য চ্ছিন্ন শিরঃ খড়্গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোদ্ধধিঃ পানিকাম॥
মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথা চৈখ দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্ব্বিতাম॥
কর্ণাবতং সতানীত শবযুগ্ম ভয়ানকাম।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম।
সৃক্কদ্বয় গলদ্রুক্তধারা বিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানলয় বাসিনীম।
বালার্ক মণ্ডলাকার লোচনত্রিতয়ান্বিতাম॥
দন্তরাং দক্ষিণব্যাপি মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্।
শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্॥
শিবাভির্ঘোর রাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্॥
সুখপ্রসন্ন বদনাং স্মেরানন সরোরুহাম্।
এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্বকামসমৃদ্ধিদাম্॥

(তন্ত্রসার)

দক্ষিণা কালীকাদেবী করালবদনা, চতুর্ভুজা, ভীষণাকৃতি ও আলুলায়িত কেশা। দেবীর গলদেশে মুণ্ডমালা, বামভাগে অধঃকরে সদ্য ছিন্ন মুণ্ড, ঊর্ধ্বকরে খড়্গ এবং দক্ষিণ ভাগের অধঃকরে অভয় ও ঊর্দ্ধহস্তে বরমুদ্রা।

দেবী গাঢ় মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা ও দিগম্বরী। উহার গলে যে মুণ্ডমালা আছে, তাহা হইতে শোণিত ধারা নির্গলিত হইয়া সর্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিতেছে। তাঁহার কর্ণে দুইটি শবশিশু অলঙ্কাররূপে বিদ্যমান। ইহাতে দেবীর আকৃতি আরও ভীষণ, দশনপংক্তি অতি বিভীষণ। স্তন-যুগল স্থূল ও উচ্চ এবং শবনির্মিত কাঞ্চী কটি দেশে শোভমান। কালিকা দেবী হাস্যবদনা, ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে বিগলিত রক্তধারায় মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল। দেবীর শব্দ অতিশয় গম্ভীর। ইনি শ্মশানবাসিনী। নেত্রদ্বয় নবোদ্ভাসিত সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, দশনপংক্তি উন্নত ও বহির্গত, কেশপাশ দক্ষিণ-ব্যাপি ও আলুলায়িত। তিনি শবরূপী শিরোপরি অবস্থিতা। তাঁহার চতুর্দিকে শিবাগণ ঘোররূপে চীৎকার করিতেছে। তিনি মহাকালের সহিত বিপরীত রত্যাসক্তা; দেবীর মুখমণ্ডল হাস্য বিকশিত (কৃষ্ণা-নন্দের তন্ত্রসার থেকে গৃহীত)।

মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—

ত্বং সর্ব্বরূপিণী দেবী সর্ব্বেষাং জননীপরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ ॥
সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসী-স্তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া ॥ (চতুর্থোল্লাস)

দেবী তুমি সর্বরূপিণী ও সকলের পরম জননী; সুতরাং তুমি পরিতুষ্ট হইলে, সকলেরই পরিতোষ হয়। সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র তুমিই তমোরূপে বিদ্যমান ছিলে; তোমার সেই অব্যক্তরূপ বাক্য ও মনের অগোচর। পরে পরমব্রহ্মের অর্থাৎ মূল প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত তুরীয় ব্রহ্মের সিসৃক্ষা অনুসারে তোমারই রূপান্তর তমোরূপে শক্তি হইতে নিখিল জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। (অনুবাদ-জগন্মোহন তর্কালঙ্কার)। এই সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব অনেক পরের সংযোজন। এই একই গ্রন্থে কালীকে বলা হয়েছে—

কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকাপরা ॥

কালসংগ্রাসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাৎ আদ্যা কালীতে গীয়তে॥
পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতি।
বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে॥
সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।
ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্তং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা॥ (চতুর্থোল্লাস)

কলন অর্থাৎ গ্রাস কর, এই নিমিত্ত তুমি পরাৎপরা আদ্যাকালিকা। তুমি কালকে গ্রাস কর, এই নিমিত্ত তোমার নাম কালী এবং তুমি সকলের আদি। তুমি সকলের কালস্বরূপা এবং সকলের আদিভূতা অর্থাৎ কারণ স্বরূপা বলিয়া তোমাকে সকলে আদ্যাকালী বলিয়া কীর্তন করে। আবার প্রলয় কালে বাক্যের অতীত, মনের অগম্য, তমোময়, নিরাকার, অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বন পূর্বক একমাত্র তুমিই বিদ্যমান থাক; সুতরাং তুমি সাকারা হইয়াও নিরাকারা এবং তুমি মায়া-দ্বারা বহুরূপ অবলম্বন করিয়া থাক। তুমি সকলের আদি, কিন্তু তোমার আদি কেহই নাই। তুমিই রজোগুণ দ্বারা সকলের সৃষ্টি কর্ত্রী সত্বগুণ দ্বারা সকলের পালন কর্ত্রী ও তমোগুণ দ্বারা সকলের সংহার কর্ত্রী (অনুবাদ—জগন্মোহন তর্কালঙ্কার)।

কালিকা পুরাণে কালীর দেবীত্বের বর্ণনায় বলা হয়েছে—বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী দেবী দক্ষের কন্যারূপে যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনি সিংস্থা কালিকা কৃষ্ণা। তিনি দেহত্যাগ করে নীলোৎপল দলাভুগা হয়ে পুনরায় জন্ম নেন হিমালয় রাজার ঘরে। তিনি পরে কালী নামে প্রসিদ্ধা হয়েছেন। পার্বতী কালীর বয়স হলে নারদ হিমালয়রাজার কাছে গিয়ে শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিয়ের প্রস্তাব করে। নারদ আরও বলে তপস্যার দ্বারা শিবকে তুষ্ট করতে পারলে এই কালি কন্যা স্বর্ণগৌরী, বিদ্যুৎগৌরী হয়ে উঠবে।

দেবী ভাগবতে (পঞ্চম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়) এবং মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীতে বলা হয়েছে, দেবীর শরীর থেকে কৌশিকী দেবী নির্গতা হলে

দেবীর রং কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং তিনি কালিকারূপে খ্যাতা হন। এই কালিকাই কাল রাত্রি। সৌরপুরাণ এবং পদ্মপুরাণেও এই একই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দেবীপুরাণে কালীকে মূল দেবীর সঙ্গে অভিন্নারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দেবী পুরাণে কালীর নাম অন্যান্য দেবীর নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।—

গৌরী কালী উমা ভদ্রা দুর্গা কান্তিঃ সরস্বতী।
মঙ্গলা বৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ শিবা নারায়ণী ক্রমাৎ ॥

(দেবী পুরাণ—৬০ অধ্যায়)

প্রথমে কালী চামুণ্ডা কালী নামে অভিহিতা ছিলেন। দেবী পুরাণেব শ্লোকে এবং অন্যত্রও এই কথাই বলা হয়েছে—

ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে শ্মশানবাসিনী খট্বাঙ্গ কপলা হস্তে মহাপ্রেত সমারূঢ়ে (১ম অধ্যায়)

এই চামুণ্ডা কালীই মহাদেবীব সঙ্গে অভিন্না। চামুণ্ডা নামটি দশমহাবিদ্যার অন্যতম বিদ্যারূপে পরে বর্ণিত হয়েছে। চামুণ্ডা দেবী যে পরে মহাদেবীর সঙ্গে অভিন্না হয়েছেন তার বর্ণনা মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীতে আছে। সেখানে বলা হয়েছে, ইন্দ্র শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করতে না পেরে দেবীর সাহায্য চাইতে যান। দেবীর সামনে উপস্থিত হলে দেবীর শরীর থেকে আর এক দেবী সমুদ্ভূতা হন। পার্বতীর শরীর থেকে নির্গতা হয়েছেন বলে তাঁর নাম হয় কৌশিকী (এই নামটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি)। কৌশিকী দেবী পার্বতীর শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে পার্বতী কৃষ্ণবর্ণা হয়ে যান। এই হিমালয় অঞ্চলে তিনি কালিকা নামে খ্যাতা। আবার এই মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীতেই অন্যস্থানে আছে শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয়ের অনুচর চণ্ড-মুণ্ড দেবীর নিকট উপস্থিত হলে দেবীর ক্রোধের উদ্রেক হয়, তাঁর ভ্রুকুটি-কুটিল ললাট থেকে অসিপাশধারিণী করালবদনা কালী বিনিষ্ক্রান্তা হন। বিচিত্র নরকঙ্কালধারিণী, নরমালা বিভূষণা, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, অতি ভৈরবী, অতিবিস্তার বদনা, লোলজিহ্বা, কোটরগত রক্তবর্ণ চক্ষু বিশিষ্টা দেবীর নাদে চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে—

ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তা নরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা॥
ভ্রূকুটী কুটিলাৎ তস্যা ললাটফল কাদক্রুতম্।
কালী করাল বদনানা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥
বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্ক মাংসাতিভৈরবা॥
অতি বিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নরক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥

(৭ম অধ্যায়-৫।৬।৭।৮)

এই কালী শত্রুবধ করতে গিয়ে যা করেছেন তার বর্ণনা ভয়ঙ্কর। দেবী অসুরদের সৈন্য দলের মধ্যে প্রবেশ করে মহা অসুরদের বিনাশ করতে করতে সৈন্যদের ভক্ষণ করতে লাগলেন। হস্তীগুলিকে হাতে নিয়ে গ্রাস করতে লাগলেন। এমনকি ঘোড়াসহ যোদ্ধাকে, সারথিসহ রথকে মুখে ফেলে চর্বণ করতে লাগলেন। অসুরদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলি মুখে গ্রহণ করে চূর্ণ করলেন। অসুরদের কাউকে মর্দন করলেন, কাউকে ভক্ষণ করলেন, কাউকে তাড়িয়ে দিলেন। মহাসুর চণ্ড শর বর্ষণের দ্বারা এবং মুণ্ড চক্রসমূহের দ্বারা দেবীকে ছেয়ে ফেললো। কিন্তু চক্রগুলি দেবীর মুখগহ্বরে শোভা পেতে লাগলো। তারপর দেবী ভীষণভাবে অট্টহাস্য করে মহাখড়্গ তুলে চণ্ডের প্রতি ধেয়ে গিয়ে তার চুল ধরে শিরোচ্ছেদ করলেন। তখন মহাসুর মুণ্ড দেবীর দিকে ধেয়ে গেলে দেবী তাকে খড়্গের দ্বারা আহত করে ভূমিতে ফেলে দেন। চণ্ড-মুণ্ডের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে দেবী চণ্ডিকার কাছে গিয়ে বললেন এই দুই মহাপশু তোমাকে উপহার দিলাম। চণ্ডিকা বললেন, তুমি চণ্ডমুণ্ডকে বিনাশ করেছ সেইজন্যে তুমি চামুণ্ডা নামে খ্যাতা হবে।

কালীর এই ভয়ঙ্কর রূপ আরও একবার দেখতে পাওয়া যায় মার্কেণ্ডেয় পুরাণে রক্ত বীজ বধের সময়। রক্তবীজ বধের সময় কালী চণ্ডিকাকে সাহায্য করেছিলেন। অস্ত্রাঘাতে রক্ত বীজের শরীর থেকে

রক্ত ভূমিতে পড়ামাত্র সেই রক্ত থেকে অসংখ্য অসুর উত্থিত হচ্ছিল। তাই দেখে চণ্ডিকা কালীকে বলেন তুমি বদন বিস্তার করে রক্তবীজের নির্গত রক্ত গ্রহণ কর এবং অসুরদের ভক্ষণ কর। এই কথা বলে দেবী রক্তবীজকে অস্ত্রদ্বারা আহত করলে কালী রক্তবীজের শরীর লেহন করতে লাগলেন এবং যত অসুর জন্মাতে লাগলো সবগুলিকে কালী ভক্ষণ করলেন। রক্তবীজ রক্তহীন হলে দেবী তাকে হত্যা করেন।

এইসব বর্ণিত বিষয় অবাস্তব। এর মধ্যে বাস্তবতার নাম গন্ধ নেই। দেবী সম্পর্কে মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করাই এগুলির উদ্দেশ্য। দেব-দেবী এবং অন্যান্য সংস্কার মানার ব্যাপারে নানাপ্রকার ভীতি প্রদানের ব্যবস্থা মনুর বিধানের কাল থেকেই চলে আসছে। কোন নারী কর্তৃক শত্রুবধ সম্ভব এবং বাস্তব সম্মত কিন্তু তাদের বধের জন্যে দেবী যা যা করেছেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট। দেবীর ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনায় বর্ণনাকারী নিজের অজান্তেই মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

অনেক পুরাণে এবং উপপুরাণে এ ধরনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আগে যে কৌশিকী দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে সেই দেবী কুশিক আদিবাসীদের দেবী ছিলেন। ভাণ্ডারকার এই মতটি পোষণ করেন। এই কৌশিক দেবীই শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করেছিলেন। কিন্তু পদ্ম পুরাণে আছে দেবীর শরীর থেকে কৃষ্ণবর্ণা যে রাত্রিদেবী বের হন তিনিই কৌশিকী। এই দেবীকে ব্রহ্মা বিন্ধ্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিতা হতে বলেন। মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীতে এবং কালিকা পুরাণে যে ভিন্ন চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তা আগেই উল্লেখ করেছি।

(মহানির্বাণ তন্ত্রে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দ্বারা কালীর রূপের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।) দেবী পার্বতী মহাদেবকে প্রশ্ন করেন—"যিনি মহদ্‌যোনি অর্থাৎ যাঁহা হইতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহা হইতে মহত্তত্ত্ব অবধি স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায় জগৎ প্রকাশমান হইতেছে। যিনি মহাদ্যুতি অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই অবিরলভাবে দ্যোতমান হইতেছেন,

তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম অর্থাৎ যিনি নিতান্ত দুর্জ্জেয়, সেই আদ্যা-শক্তি মহাকালীর রূপ নিরূপণ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে! দেব! প্রাকৃতিক কার্য অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পাঞ্চভৌতিক ঘট পট প্রভৃতিরই রূপ আছে। মহাকালী সাক্ষাৎ পরাৎপরা, সুতরাং তাহার আবার রূপ কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে! দেব! আমার এই বিষয়ে বিশেষ রূপ সংশয় আছে; আপনি আমার এই সংশয় অপনয়ন করুন।"

শ্রীসদাশিব কহিলেন। প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট বলিয়াছি যে, কেবল উপাসকদিগের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্তই গুণ ও ক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ কল্পনা করা হইয়াছে; বাস্তবিক তাঁহার কোন প্রকার রূপ থাকা সম্ভাবিত নহে। শৈলতনয়ে! শ্বেতপীত প্রভৃতি সমুদায় বর্ণই যেমন একমাত্র কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেই রূপ সমুদায় পদার্থই আদ্যাকালীতে বিলীন হইয়া থাকে, এই কারণেই যোগরূঢ়া মহাত্মারা সেই নির্গুণা নিরাকারা বিশ্বহিতৈষিণী কাল শক্তির (কালীর) বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। যিনি নিত্যা (পরিণতি শূন্যা বাল্য যৌবনাদি রহিতা), অব্যয়া (ক্ষয়াপচয় রহিতা), কালরূপা, শিবাত্মিকা ও কল্যাণময়ী; বিশেষত তিনি অমৃত স্বরূপা বলিয়া তাহার ললাটে চন্দ্রের অমৃত স্রাবণী অক্ষয়া অমাকলা কল্পিত হইয়াছে। তিনি চন্দ্রসূর্য্য ও অগ্নিরূপ নয়নত্রয় দ্বারা নিয়ত এই কালসম্ভূতা জগৎ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন; এই কারণে যোগরূঢ় মহাত্মারা তাঁহার নয়নত্রয় কল্পনা করিয়াছেন। তিনি প্রলয়কালে সমুদায় প্রাণীকে গ্রাস করেন ও কাল-দন্ত দ্বার চর্ব্বণ করেন; এই কারণে সর্ব্বপ্রাণীর রুধিরসমূহ সেই মহেশ্বরীর রক্ত বসন রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। শিবে! তিনি জীবগণকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন এবং সর্ব্বদা বিপদ হইতে উদ্ধার ও রক্ষা করিয়া থাকেন; এই কারণে তাঁহার করদ্বয় বর ও অভয়ভাব কল্পনা করা হইয়াছে। ভদ্রে! তিনি রাজোগুণজনিত বিশ্বে সর্ব্বতোভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন; এই কারণে কথিত হইয়া থাকে যে, তিনি রক্ত-কমলাসনে সমাসীনা রহিয়াছেন। সৃষ্টি সময়ভূত সৃষ্টিকালব্যাপী মহাকাল

মোহময়ী সুরাপান করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, অর্থাৎ কালপ্রভাবে কোথাও শূন্যময় স্থান নূতন জগতে পরিপূর্ণ হইতেছে, কোথাও প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ জগৎ শূন্যময় হইতেছে, কোথাও গাঢ় অন্ধকারময় স্থান আলোক ময় হইতেছে, কোথাও অপূর্ণ আলোকময় স্থান অন্ধকারময় হইয়া যাইতেছে, প্রত্যেক জগৎ—প্রত্যেক নক্ষত্র যথাপথে ধাবমান হইতেছে, সর্ব্বসাক্ষী স্বরূপিণী চিন্ময় দেবী ইহা দর্শন করিতেছেন। অল্পজ্ঞান সম্পন্ন ভক্তবৃন্দের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত উক্ত প্রকার গুণানুসারেই সেই ভগবতীর বহুবিধরূপ পরিকল্পিত হইয়াছে।" (মহানির্বাণতন্ত্র—ত্রয়োদশোল্লাস,—অনুবাদ—জগন্মোহন তর্কালঙ্কার)।

উদ্ধৃতিটি একটু দীর্ঘ হলো। বুঝবার সুবিধার জন্যেই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। মহাদেবের উক্তির মধ্যেই আছে মহাকালীর ধ্যানারূপ (বিভিন্ন) কল্পিত হয়েছে। (মহাত্মাদের কাছে দেবী একটাই (তিনি নিগু'ণা নিরাকারা)। আর অল্পজ্ঞান ভক্তদের হিতের জন্যে দেবীর বিভিন্ন গুণানুসারে দেবীর বিভিন্ন রূপ পরিকল্পিত হয়েছে।) নানা গল্প কথা নানা বিশ্বাস ও সংস্কার এসে মিশেছে পুরাণে ও তন্ত্রে। আর এসবই মানুষের রচিত। তথা কথিত দেব-দেবী কোথাও মানুষকে জ্ঞান দান করেননি। মানুষ তার নিজের ইচ্ছে মত, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এবং কিছুটা সামাজিক প্রয়োজন মিটাবার জন্যে বিবিধ গ্রন্থ রচনা করেছে। অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত মানুষের মনের মধ্যে বিষয়টিকে প্রবিষ্ট করাবার জন্যে অনেক কিছুকেই দেব-দেবীর উক্তি বলে প্রচার করা হয়েছে। যাঁরা একাজ করেছেন তাঁরা মানুষের মন সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত ছিলেন। সুতরাং তাঁদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে। শুধু অশিক্ষিত বা অধশিক্ষিতদের নয়, শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও তাঁরা প্রভাবিত করতে পেরেছেন দীর্ঘকালের সংস্কারজনিত কারণে।

(হিন্দুতান্ত্রিক দেবীদের মধ্যে অসংখ্য দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়)(পরে আমরা মহাদেবীর শত নামের উল্লেখ করবো)। (এদের মধ্যে শক্তিকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত দশমহাবিদ্যার রূপই প্রধান।)

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ (চামুণ্ডাতন্ত্র)

কালীর ধ্যান রূপের বর্ণনা আগেই দিয়েছি। তবু বুঝবার সুবিধের জন্যে দশমহাবিদ্যার ধ্যানরূপ পর পর দেওয়া হলো। কালী উলঙ্গিনী, চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা, সহাস্যবদনা, নরমুণ্ডমালা বিভূষিতা, বাঁদিকে নিচের হাতে নরমুণ্ড, উপর হাতে খড়্গ, ডানদিকে নিচের হাতে অভয়মুদ্রা, উপর হাতে বরমুদ্রা, শিবের ওপর দণ্ডায়মানা। তারা খর্বা, লম্বোদরী, ভয়ঙ্করাকৃতি, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, চতুর্ভুজা, নবযুবতীরূপা, নরমুণ্ডমালা বিভূষিতা, শবেরওপর দণ্ডায়মানা। ষোড়শী ত্রিনয়নী, চতুর্ভুজা বিশ্ববিমোহিনী, পদ্মরাগমণির মত দেহচ্ছটা, চঞ্চলা, হাস্যময়ী। ভুবনেশ্বরী ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা, সহাস্য-বদনা, পিনোন্নত পয়োধরা, উদিত সূর্যের ন্যায় দেহকান্তি, কপালে অর্ধচন্দ্র ও মুকুট পরিহিতা। ভৈরবী কপালে অর্ধচন্দ্র রক্তবর্ণা, দেহকান্তি উদয়কালীন সূর্যের ন্যায়, ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিতা, চতুর্ভুজা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা,মুকুট পরিহিতা, চারিহস্তে জপমালা-পুস্তক-অভয়মুদ্রা-বরমুদ্রা। ছিন্নমস্তা ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীর ন্যায় আকৃতি, স্তনদ্বয় উন্নত ও স্থূল, বিবসনা, ভয়ঙ্করী এবং আলুলায়িত কেশ, বামহস্তে নিজ ছিন্নমস্তক এবং নিজ কণ্ঠোত্থিত রক্ত পানে রতা। ধূমাবতী বিবর্ণা,চঞ্চলা রুষ্টা, বিবর্ণা কুন্তলা, কাকধ্বজ রথে আরোহণা। বগলা পীতবর্ণা, দ্বিভূজা মাল্য পরিহিতা, মণিময় মণ্ডপে রত্ননির্মিত বেদীর উপর সিংহাসনে উপবিষ্টা। মাতঙ্গী শ্যামবর্ণা, অর্ধচন্দ্র ধারিণী, ত্রিনয়নী, রত্ননির্মিত সিংহাসনে উপবিষ্টা। কমলার দেহকান্তি কাঞ্চনের ন্যায়, চতুর্ভুজা, রত্নমুকুট পরিহিতা, পদ্মের ওপর উপবিষ্টা।

এই হলো দশমহাবিদ্যার ধ্যানরূপ। একই মহাদেবী বা শক্তি বিভিন্ন নামে অভিহিতা একথা বারে বারে বলেছি। দেবীর নামের শেষ নেই। মহানির্বাণ তন্ত্রে দেবীর শত নামের বর্ণনা আছে। মাকে

নানা নামে ডেকে ভক্ত আনন্দ পান। আবার যার যে রূপ পছন্দ সে সেই রূপেই মায়ের ধ্যান করেন। বাস্তব জগতেও আমরা দেখি অনেকেরই একাধিক নাম আছে, বিশেষত মেয়েদের। তবে দশ-মহাবিদ্যার দশটি ধ্যানরূপের পরিকল্পনার মধ্যে কিছু তাৎপর্য বর্তমান। এর মধ্যে শুধুমাত্র মহাশক্তিকে বিভিন্ন ধ্যানরূপে আরাধনার প্রবণতা নেই, আরও কিছু আছে। সেই কিছুটা কি—তা ব্যাখ্যা করবার আগে মহা-নির্বাণ তন্ত্রে দেবীর শতনামের তালিকা ও বর্ণনা উদ্ধৃত করে নিই। (মহা-নির্বাণ তন্ত্রের সপ্তমোল্লাসে দেবীর শতনাম বর্ণিত হয়েছে। মূল শ্লোক উদ্ধৃত না করে কেবল অনুবাদটি দেওয়া হলো)। মহাদেব দেবীকে দেবীব শতনাম ও স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

"তুমি হ্রীঁ অর্থাৎ মায়াবীজ স্বরূপা ও কালী অর্থাৎ কালশক্তি। তুমি শ্রীঁ অর্থাৎ লক্ষীবীজ স্বরূপা ও করালী। তুমি ক্রীঁ স্বরূপা (তন্মধ্যে ক অর্থে কালী, র অর্থে ব্রহ্ম, ঈ অর্থে মামায়া, ঁ অর্থে বিশ্বমাতা এবং ০ অর্থে দুঃখহরা) ও কল্যাণী। তুমি কলাবতী, কমলা, কলি-দর্পঘ্নী এবং কপর্দ্দীশ অর্থাৎ শিবের প্রতি কৃপান্বিতা। তুমি কালিকা, কালমাতা এবং কালানল-সমদ্যুতি অর্থাৎ তোমার তেজ কালাগ্নি সদৃশ। তুমি কপর্দ্দিনী ও করালবদনা। তুমি করুণামৃতসাগরা, কৃপাময়ী ও কৃপাধারা। তুমি কৃপাপারা অর্থাৎ তোমাব অপার কৃপা। তুমি কৃপাগমা অর্থাৎ তুমি যাহাকে কৃপা কর, সেই তোমাকে জানিতে পারে। তুমি কৃশানু, কপিলা, কৃষ্ণা ও কৃষ্ণানন্দ-বিবর্দ্ধিনী। তুমি কাল রাত্রি, কামরূপা ও কামপাশ বিমোচনী। তুমি কাদম্বিনী, কলাধারা এবং কলি-কল্মষ-নাশিনী অর্থাৎ তুমিই কলির পাপ ধ্বংস করিয়া থাক। তুমি কুমারী পূজাতে প্রীতা হইয়া থাক ; তুমি কুমারী পূজকের আলয়ে বাস কর ; কুমারী ভোজন করাইলে তোমার আনন্দ হয়; কারণ তুমিও কুমারী রূপ-ধারিণী। তুমি কদম্ববন সঞ্চারী, কদম্ববন-বাসিনী, কদম্বপুষ্প সন্তোষী এবং কদম্বপুষ্প মালিনী অর্থাৎ কদম্ব বনে ভ্রমণ করিয়া থাক, কদম্ব বনে বাস কর, কদম্বপুষ্পে তোমার সন্তোষ লাভ হয় এবং তুমি কদম্বমালা ধারণ

করিয়া থাক। তুমি কিশোরী, তুমি কলকণ্ঠা অর্থাৎ কণ্ঠস্বর অতীব সুমধুর। তুমি কলনাদ-নাদিনী, কাদম্বরী পানরতা এবং কাদম্বরী প্রিয়া অর্থাৎ গৌড়ী মদিরা তোমার অতীব প্রিয়। তুমি নর-কপাল পাত্র নিরতা অর্থাৎ মহাপাত্রে পরিতুষ্টা। তুমি কঙ্কালমাল্যধারিণী অর্থাৎ শরীরাস্থির মালা ধারণ করিয়া থাক। তুমি কমলাসন-সন্তুষ্টা ও কমলাসন-বাসিনী অর্থাৎ পদ্মাসনে উপবিষ্টা রহিয়াছ। তুমি কমলালয় মধ্যস্থা ও কমলামোদ-মোদিনী অর্থাৎ কমলগন্ধে তোমার আনন্দ লাভ হয়। তুমি কলহংস গতি (কল-হংসের ন্যায় মন্থরগামিনী)। তুমি ক্লৈব্যনাশিনী (ভক্তগণের কাতরতা দূর করিয়া থাক), তুমি কামরূপিণী অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে নানারূপ ধারণ করিয়া থাক। তুমি কামরূপ-কৃতবাসা অর্থাৎ কামরূপে নিয়ত অধিষ্ঠান করিতেছ। তুমি কামপীঠ-বিলাসিনী অর্থাৎ তুমি কামাখ্যা নামক মহাপীঠে বিহার করিয়া থাক। তুমি কমনীয়া কল্পলতা-স্বরূপা এবং কমনীয় বিভূষণ বিভূষিতা তুমি কমনীয় গুণারাধ্যা অর্থাৎ কমনীয় গুণসমূহ দ্বারাই তোমাকে আরাধনা করিতে পারা যায়। তুমি কোমলাঙ্গী কৃশোদরী ও কারণামৃত-সন্তোষা অর্থাৎ কুলামৃত রূপশোভিত সুধা দ্বারা তোমার প্রীতি লাভ হইয়া থাকে। তুমি কারণানন্দ সিদ্ধিদা অর্থাৎ কারণ দ্বারা যাহার আনন্দ হয়, তাহাকে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাক। তুমি কারণানন্দ-জাপেষ্টা অর্থাৎ যাহারা কারণানন্দে পূর্ণানন্দ হৃদয়ে তোমার জপ করে, তুমি তাহাদেরই ইষ্টদেবতা। তুমি কারণার্চ্চন-হর্ষিতা অর্থাৎ যে তোমাকে কারণ দ্বারা পূজা করে, তৎ প্রতি তুমি প্রীতা হইয়া থাক। তুমি কারণার্ণব-সংমগ্না অর্থাৎ সমগ্র কারণ বারিতে তোমার নিয়ত অধিষ্ঠান। তুমি কারণ ব্রত পালিনী। তুমি কস্তুরী সৌরভামোদা, অর্থাৎ কস্তুরী গন্ধে তুমি আনন্দিতা হইয়া থাক। তুমি কস্তূরী তিলকোজ্জ্বলা অর্থাৎ কস্তূরী তিলক ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব দীপ্তি লাভ করিয়া থাক। তুমি কস্তুরী পূজনরতা ও কস্তুরী পূজক প্রিয়া অর্থাৎ যে কস্তূরী দ্বারা তোমার পূজা করে, তুমি তাহাতেই অনুরক্ত এবং সে তোমার অতীব প্রিয়। তুমি কস্তুরী দাহ-জননী অর্থাৎ যে ব্যক্তি

তোমার পূজাকালে কস্তুরীর ধূপ দেয়, তুমি তাহাকে জননীর ন্যায় পালন করিয়া থাক। তুমি কস্তুরী মৃগ-তোষিণী, কস্তুরী ভোজন-প্রীতা এবং কর্পূরামোদ-মোদিতা অর্থাৎ তুমি কর্পূর গন্ধে আমোদিতা হইয়া থাক। তুমি কর্পূরমালাভরণা ও কর্পূর চন্দনোক্ষিতা অর্থাৎ তোমার অঙ্গ সতত কর্পূর মিশ্রিত চন্দন দ্বারা চর্চ্চিতা। তুমি কর্পূর কারণাহ্লাদা অর্থাৎ কর্পূরযুক্ত সুধাতে তোমার আনন্দ বর্দ্ধন হইয়া থাকে। তুমি কর্পূরা-মৃতপায়িনী অর্থাৎ কর্পূর সুবাসিত সুধাপান করিয়া থাক। তুমি কর্পূর-সাগর স্নাতা ও কর্পূর সাগরালয়া। তুমি কূর্চ্চ-বীজ জপ প্রীতা অর্থাৎ হূঁ এই বীজ জপে পরিতুষ্টা হইয়া থাক। তুমি কূর্চ্চ জপ পরায়ণা অর্থাৎ দৈত্যদলন কালে তুমি নিরন্তর হুঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাদের তেজোহ্রাস করিয়া থাক। তুমি কুলীনা, কৌলিকারাধ্যা ও কৌলিকপ্রিয়-কারিণী অর্থাৎ তুমি নিরন্তর কৌলগণের হিতানুষ্ঠানে নিরতা। তুমি কুলাচারা অর্থাৎ কুলাচাররতা, কৌতুকিনী এবং কুলমার্গ প্রদর্শিনী। তুমি কাশীশ্বরী, তুমি কষ্টহর্ত্রী অর্থাৎ ভক্তগণের ক্লেশ দূর কর। তুমি কাশীশ বরদায়িনী। তুমি কাশীশ্বর কৃতামোদা এবং কাশীশ্বর মনোরমা। তুমি কলমঞ্জীর চরণা অর্থাৎ তোমার চরণযুগলের মঞ্জীরদ্বয় সুমধুর শব্দপূর্ণ। তুমি ক্বণৎ কাঞ্চী বিভূষণা অর্থাৎ তুমি সুমধুর ধ্বনিপূর্ণ কাঞ্চীগুণে বিভূষিতা। তুমি কাঞ্চনাদ্রি কৃতাগারা এবং কাঞ্চনাচলকৌমুদী অর্থাৎ তুমি কাঞ্চনাচলবাসিনী ও কাঞ্চনাচলের জ্যোৎস্না স্বরূপা। তুমি কামবীজ জপানন্দা অর্থাৎ ক্লীঁ এই বীজ জপে তোমার প্রীতি লাভ হয়। তুমি কামবীজ স্বরূপিণী। তুমি কুমতিঘ্নী ও কুলীনার্ত্তি নাশিনী অর্থাৎ তোমার প্রসাদেই কুমতির বিনাশ হয় এবং কৌলগণের দুঃখ দূর হইয়া থাকে। তুমি কুলকামিনী এবং তুমি ক্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই তিন বর্ণদ্বারা কালরূপ করাল কণ্টক উদ্ধার করিয়া থাক” (মহানির্বাণ তন্ত্র—সপ্তমোল্লাসঃ—১২-৩২)।

এই হলো দেবীর শতনাম স্তোত্র। এই শতনাম স্তোত্রের মধ্যে আমরা কি দেখি! এইসব শতনাম স্তোত্র রচনা করবার সময় রচয়িতারা

সমাজের এবং মানুষের বিভিন্ন দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। মেয়েদের শারীরিক গঠন ও চাল-চলন যে রকম হলে ভাল হয় এবং যাকিছুতে সমাজের লাভ হয় সেই সমস্ত গুণ দেবীর মধ্যে আরোপ করা হয়েছে। যা কিছু তার সবই দেবী পছন্দ করেন। আর দেবী যখন, তখন তো ভক্তগণের উপকার করবেন নানাভাবে। দুটি ব্যাপার একটু অদ্ভুত লাগতে পারে অনেকের কাছে। ব্যাপার দুটি হলো— কাম এবং কারণ বারির প্রতি দেবীর আসক্তি। একটু চিন্তা করলে এবং সমাজস্থ মানুষের স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রাখলে কামের ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। কাম তো জীবের স্বাভাবিক প্রবণতা। কাম ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব নয়। নর-নারীর প্রেম ভালবাসা ছাড়াও আর একটি ব্যাপার হলো কাম। এর আকর্ষণ সুতীব্র। সেই অনাদিকাল থেকেই এটা চলে আসছে শুধু মনুষ্য সমাজে নয়, সমগ্র জীব জগতে। সুতরাং কামকে বাদ দিয়ে সমাজ চলতে পারে না। কাম যদি বিপথগামী না হয় তবে তা ক্ষতিকর নয়। তবে কোন কোন পুরুষ বা রমণী কামের প্রতি বেশি আসক্ত। এই আসক্তি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তা সমাজের অমঙ্গল ডেকে আনে না। কামাবেগে স্বামী-স্ত্রী নির্মল আনন্দ উপভোগ করলে কারো কিছু বলবার নেই। দেবীর শতনাম স্তোত্রের মধ্যে দেখি দেবী কামের প্রতি আসক্তা। এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। মানবীয় গুণ বা দোষ দেবীর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। এর পেছনে কয়েকটি কারণ থাকতে পারে—১. যে সমাজে কালীর পূজা প্রচলিত ছিল সেই সমাজে নারীরা হয়তো অতিরিক্ত কামাসক্ত ছিল। সেই জনশ্রুতি যুগ যুগ ধরে লোকের মুখে মুখে ফিরেছে এবং পুরাণের যুগে পৌরাণিক কাহিনী ও তন্ত্র গ্রন্থ রচনা কালে সেটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। ২. কোন রক্ত মাংসের নারীর এমন কিছু অসাধারণ গুণ ছিল যার জন্যে তাকে তুষ্ট করবার প্রয়াসে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই নারী বোধহয় অতিরিক্ত কামাসক্ত ছিল। ৩. আদিম কাল থেকে মানুষ তাদের ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে এবং

জেনেছে নর-নারীর যৌন মিলনের ফলেই নতুন সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে। তাই তখন থেকে বিভিন্ন দেশের মানুষ আকাশকে পিতা ও পৃথিবীকে মাতা বলেছে। এই উভয়ের মিলনেই জগৎ ও জগতের যাবতীয় বিষয় সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রচলিত ধারণা অনুসারে মনে করা হয়েছে নারীর কামের প্রতি আসক্তি থাকাই স্বাভাবিক। জীবজগতে এর যখন ব্যতিক্রম নেই তখন যাঁরা সব কিছুর স্রষ্টা তাঁদের মধ্যেও কোন ব্যতিক্রম থাকতে পারে না। ৪. যাঁরা পৌরাণিক কাহিনী ও তন্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা তাঁদের সমাজেও নারী ছিল কামের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তা এবং নিজেরাও কামের বশীভূত ছিলেন। ৫. আদিম সভ্যতায় এবং তার পরবর্তী কালের সভ্যতায় আনন্দানুষ্ঠানের বেশি কিছু ব্যবস্থা ছিল না। (এখনো আদিবাসী জাতি ও উপজাতিদের মধ্যেও এর অভাব আছে) সঙ্গত কারণেই মানুষ কামজনিত ব্যাপারটাকেই তাদের জীবনের আনন্দানুষ্ঠান উপভোগের অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে ধরে নিয়েছিল। কামজনিত ব্যাপার মানুষকে আনন্দ দেয়। সুতরাং যা মানুষকে আনন্দ দেয় তা সহজেই দেব-দেবীর ওপর আরোপ করা চলে। এতে অন্যায় কিছু নেই বলেই তা করা হয়েছে। ৬. আদিম সমাজের ও অন্ত্যজ সমাজের দেবীকে আর্যায়িত করবার সময় কোন বিরূপ মনোভাব থেকে এমনটা করা হয়েছে। ৭. নিজেদের কার্যসিদ্ধি অর্থাৎ নিজেদের কামবেগকে সম্ভোগের মধ্যে দিয়ে প্রশমন করবার জন্য দেবীর নাম দিয়ে নারীকে প্রলুব্ধ করবার প্রচেষ্টা। ৮. শিব ও শক্তির কল্পনা এবং লিঙ্গ পূজা আদিম ধারণা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। এর সঙ্গে তন্ত্রধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। পরবর্তীকালে অনার্য তন্ত্রধর্ম নানাভাবে নানা পথে বিকশিত হয়েছে। প্রাচীনকালে তন্ত্র ছিল ক্রিয়ামূলক। পরবর্তী সময়ে তন্ত্রে মন্ত্র যুক্ত হয়েছে। পঞ্চ-মকারের সাধনা (মৎস্য-মাংস মুদ্রা-মদ্য-মৈথুন) তন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নারী সঙ্গই এই উপাসনার ভিত্তি। সাধারণত বামাচারী সাধকেরাই পঞ্চ-মকারের সাধনা করেন। সম্ভবত এটি প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। আর্যরা তন্ত্র ধর্ম গ্রহণ করে তাকে নানাভাবে

বিকশিত করে তোলে এবং বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করে। এদের কাছে নারী মাত্রই পরমাপ্রকৃতি ও আদ্যাশক্তির অংশ। প্রথমে প্রকৃতি কামিনী পরে সৃষ্টির জন্যে সম্ভোগেই তার সার্থকতা। সুতরাং এই ভাবটি দেবীর ওপর আরোপ করা এদের কাছে কোন অসঙ্গত ব্যাপার নয়। অবশ্য দার্শনিক তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করে তন্ত্রধর্মকে অতি উচ্চাঙ্গের ধর্ম বলা হয়েছে।

উল্লিখিত কারণে দেবীকে কামের প্রতি আসক্তা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দেবীকে কারণ বারির প্রতি আসক্তা রূপে বর্ণনার মধ্যেও উপরোক্ত কারণগুলি বিদ্যমান। কালী সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলবার আগে দশমহাবিদ্যারূপ পরিকল্পনার পেছনে কোন কারণ বিদ্যমান কিনা তা দেখা প্রয়োজন।

দশমহাবিদ্যার রূপ কল্পনা করা হয়েছে অনেক পরে। অধিকাংশ তন্ত্রগ্রন্থ রচিত হয়েছে মধ্যযুগে। একই মহাশক্তিকে নানা দেবীতে পরিণত করা বা নানারূপে বর্ণনা করা বা ব্যক্তি বিশেষের অভিরুচি অনুযায়ী দেবীর ধ্যান ও উপাসনাব জন্যে পরিকল্পনা ছাড়াও অন্য কারণ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দশমহাবিদ্যার মধ্যে যে দশটি দেবীর নামোল্লেখ আছে তার মধ্যে কালী নাম আমরা আগে পেয়েছি। চামুণ্ডা তন্ত্রে দশমহাবিদ্যার রূপ বর্ণিত হয়েছে। আর দেবী যে ভুবনেশ্বরী তা বলাই বাহুল্য মাত্র। দেবী আদ্যা, অদ্বিতীয়া, অক্ষরা, ব্রহ্মময়ী, সর্বশক্তি স্বরূপা, মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহাযোগেশ্বরী পরা, (কালীতন্ত্র ১ম পটল)। দেবী কখনো ভয়ঙ্করী কখনো প্রশান্ত। তিনি ভীষণা আবার মধুরা, কালভয়রূপিণী আবার কালভয়হারিণী। কখনো তিনি দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা, ষড়ভুজা, অষ্টভুজা। বিশ্বরক্ষার জন্যেই তিনি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র, বরাভয় ও মুদ্রা ধারণ করেন—

চতুর্ভুজাত্বং দ্বিভুজা ষড়ভুজাষ্ট ভুজ্যাস্তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানা শস্ত্রাস্ত্রধারিণী॥

(মহানির্বাণতন্ত্র—চতুর্থোল্লাসঃ)

আগেই বলেছি দেবী নানারূপে নানাভাবে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই

তাঁর অসংখ্যমূর্তির কল্পনা করা হয়েছে। নিরাকার, নির্বিশেষ ব্রহ্মময়ীর রূপ কল্পনা করা হয়েছে। সাধকদের সাধন কার্যের সুবিধার জন্যেই দেবী রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ (কুলার্ণবতন্ত্র)

গুণ ও ক্রিয়া অনুসারে দেবীর বিভিন্ন রূপ পরিকল্পিত হয়েছে। মহানির্বাণতন্ত্রে কালীর রূপের ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি আগেই দিয়েছি। কালীমূর্তির মত প্রত্যেকটি মূর্তি এক একটি মহাভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ সবই শাস্ত্রানুমোদিত এবং তন্ত্রানুমোদিত ব্যাখ্যা। শ্রীঅরবিন্দও এই পথেই অগ্রসর হয়ে মূর্তিগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। দশমহাবিদ্যার কালী ও তারা একই প্রধান রূপের প্রকারভেদমাত্র। এই দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—এই শক্তির প্রকাশ হলো *Strength* এর পর বলেছেন—"*There is in her an overwhelming intensity, a mighty, passion of force to achieve, a divine violence rushing to shatter every limit and abstacle.*" (*Mother—Sri Aurobindo*)

কালী একদিকে সৃষ্টি অপরদিকে ধ্বংসের প্রতীক। এক হাতে খড়্গ অপর হাতে বরাভয়। গুণ ও ক্রিয়ার এই বৈপরীত্যকে লক্ষ্য রেখে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"*Fierce and trerible along with the beautiful and the delightful.*" (*Mather*)

দশমহাবিদ্যার ভৈরবীকে অরবিন্দ বলেছেন সৃজনী ও জ্ঞানদীপ্তির প্রতীক। আর ষোড়শী জগতের কল্যাণ, শ্রীও ঐশ্বর্যের প্রতীক। ভুবনেশ্বরীরূপে তিনি জননী। মাতঙ্গী দয়ার প্রতীক। কমলা মাধুরী, প্রীতি, স্নিগ্ধতা ও শ্রীর প্রতীক। "*She throws the spell of the intoxicating sweetness of the Divine : to be close to her is a profound happiness and to feel her within the heart is to make existence a rapture and a marvel ;*

grace and charm and tenderness flow outfrom her wonderful gaze or lets fall the loveliness of her smile, the soul is sized and made captive and plunged into the depth of an unfathomable bliss." (*Mother*). এ সবই শাস্ত্রানুমোদিত ভক্তের ও সাধকের ব্যাখ্যা। যুক্তিবাদের অবতারণা এর মধ্যে নেই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিও অবলম্বিত হয়নি। এসব গদ গদ চিত্তে দেবীর বিভিন্ন রূপের ব্যাখ্যা।

দশমহাবিদ্যার রূপ কল্পনার মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। এ-বিষয়ে পথ দেখিয়েছেন উনিশ শতকের কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দশমহাবিদ্যা কাব্যগ্রন্থে দশমহাবিদ্যার রূপের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। কাব্যে এ ধরনের প্রচেষ্টা অভিনব। হেমচন্দ্র সভ্যতার বিবর্তনবাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অবলম্বন করে দশমহাবিদ্যার রূপের তাৎপর্য ধরবার চেষ্টা করেছেন। তিনিই প্রথম এ ধরনের প্রচেষ্টায় হাত দিয়েছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর সামনে ছিল হিন্দুর দশাবতারবাদ। এই দশাবতার হলো—মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, বলরাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কি। অনেকেই এই দশাবতারকে ভিত্তি করে সভ্যতার ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করেছেন এবং এই ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ফলশ্রুতি। হিন্দুর দশাবতার কিভাবে সভ্যতার ক্রমবিকাশের স্বাক্ষর বহন করে তার উল্লেখ বোধহয় এখানে অবান্তর হবে না। এই বিশ্বজগৎ যখন জলমগ্ন ছিল তখনকার প্রতীক হলো মৎস্য অবতার। স্থল সৃষ্টির পর তার অবতার হলো কূর্ম। স্থল সৃষ্টির পর জগৎ অরণ্যময় হয়েছিল। সেই সময়ের অবতার বরাহ। নৃসিংহ অবতার হলো অর্ধ পশু ও অর্ধমানবের প্রতীক। বামন অবতার হলো খর্বাকৃতির নরের। পরশুরাম ও বলরাম কৃষিসভ্যতার প্রতীক হিসেবে অবতার। কৃষিসভ্যতা যখন উন্নত স্তরে পৌঁছায় তখনকার অবতার হলেন রাম। বুদ্ধদেব হলেনজ্ঞান ও প্রজ্ঞার অবতার। যখন সভ্যতা নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে শান্ত ও স্থিত হয়েছে কল্কি সেই সময়কার অবতার।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে দশাবতারকে যুক্ত করবার ব্যাখ্যাকে মুণ্ডমালাতন্ত্রে দশমহাবিদ্যাকে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। দশাবতারবাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বিত হলেও তার সঙ্গে দশমহাবিদ্যাকে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টার মধ্যে জন্মলগ্ন থেকে সভ্যতার ক্রমবিকাশের কোন স্বাক্ষর বহন করে না। মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণা কালিকা স্যাৎ রামরূপা চ তারিণী।
বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিস্যাম্মীনো ধূমাবতী ভবেৎ॥
ছিন্নমস্তা নৃসিংহ স্যাদ্ বরাহশ্চৈব ভৈরবী।
সুন্দরী যামদগ্ন্যঃ স্যাদ্ বামনো ভুবনেশ্বরী॥
কমলা বৌদ্ধরূপা স্যাদ্ দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে দশমহাবিদ্যার পরপর রূপের সঙ্গে দশাবতারের ক্রমবিকাশের কোন সম্পর্ক নেই। দশাবতারের এক রূপের সঙ্গে দশমহাবিদ্যার অন্যরূপকে মেলাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সহজেই অনুমান করা যায় যে, এর মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় নেই।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দশমহাবিদ্যা' কাব্যে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সভ্যতার ক্রমোন্নতির ধারার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন। কিভাবে তিনি দশমহাবিদ্যার রূপের সঙ্গে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেছেন তা দেখা যেতে পারে। কালী সৃষ্টির প্রথম স্তরের ইঙ্গিত বহন করেছে। সৃষ্টির প্রথম কালে ছিল ধ্বংস, মানুষে মানুষে হানাহানি। চারিদিকে সংহারের স্বাক্ষর। এই অবস্থার প্রতীক হলেন কালী। মানবসভ্যতার প্রথম প্রকাশের প্রতীক হলেন তারা। তখন সবেমাত্র জ্ঞান অঙ্কুরিত হচ্ছে। জ্ঞান অঙ্কুরিত হওয়ায় শারীরিক লজ্জা নিবারণের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। তাই তারা ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা। কিন্তু তিনি লম্বোদর নৃমুণ্ডমালিনী। তার কারণ মানুষ তখনো পরস্পর পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত এবং উদরসর্বস্ব। ষোড়শীরূপের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়

মানুষের মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের চিহ্ন। ক্ষুধার তাড়না, হানাহানি থাকলেও নরনারী দাম্পত্য প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারী হয়ে উঠেছে। দেবীও তাই পূর্ণকলা কামিনীর মত প্রেম বিস্তার করে সমগ্র জীব জগৎকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি সর্বাঙ্গ শৃঙ্গারবেশাঢ্য। নরনারীর দাম্পত্য প্রেম মিলনের ফলশ্রুতি হিসাবে জন্ম নিচ্ছে সন্তান। কামিনী তখন জননী। জননী তার স্নেহ দিয়ে সন্তান লালন পালন করছে। ভুবনেশ্বরী এই সময়ের প্রতীক। তিনি সর্বমঙ্গলা মা ও স্নেহের মূর্ত প্রতিমা। মনুষ্য সমাজে ক্রমে ক্রমে যে ভক্তির উন্মেষ দেখা যায় ভৈরবী তারই প্রতীক। ভৈরবী ভক্তি বিধায়িনী ভৈরবরূপিণী। তিনি সকলের মধ্যে ভক্তির সঞ্চার করেছেন। মাতঙ্গী সর্বমানবের প্রতি প্রীতির প্রতীক। মানুষ প্রথমে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে ভালবাসে। কিন্তু সমাজে বাস করতে গেলে সমাজের সকল মানুষের প্রতি প্রীতি ও সখ্যতার প্রয়োজন। মাতঙ্গীদেবী সেই প্রীতির সংস্কার ঘটাচ্ছেন। ধূমাবতী মানুষের হতাশা ও ক্লান্তি অপনোদনে সচেষ্ট। মানুষ ক্ষুধায় কাতর; কারণ সকলের খাওয়া জোটে না উৎপাদিত ফসলে। ধূমাবতী সেই সময়ের প্রতীক। ধূমাবতীকে তাই বিধবা ও ক্ষুৎপিপাসাতুরা করে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না। মানুষ আর কতকাল ক্ষুধায় কাতর হয়ে থাকবে। শুরু হয় দারিদ্রের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম। বগলাদেবী এই সংগ্রামের প্রতীক। দারিদ্র দলনী বগলাদেবী মানুষকে দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্রতী হওয়ার অহ্বানে জানাচ্ছেন। ছিন্নমস্তাদেবী আত্মপ্রকাশ করেছেন মানুষের মদোন্মত্ত বঞ্চনার প্রবৃত্তির মুহূর্তে। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। স্বার্থান্ধ মানুষ বুঝেছে এইভাবে জগতের কল্যাণ সাধিত হয় না। মানুষ তাই আত্মদান করে কলুষ নিবারণ করতে চেয়েছে। ।ছিন্নমস্তার নিজহস্তে নিজ মস্তক ছেদন সেই মহান ভাবের প্রতীক। সভ্যতার শেষস্তরে আত্ম প্রকাশ করে কমলা দেবী। দুঃখ-দারিদ্র থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ শান্তিতে ও সুখে বসবাস করতে শুরু করেছে। কমলাদেবী এই চরম প্রশান্তির প্রতীক।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত অক্ষয়চন্দ্র সরকারও দশমহাবিদ্যার রূপের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দুজনের ব্যাখ্যার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। হেমচন্দ্র সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে মূর্তিগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর অক্ষয়চন্দ্র সরকার ভারতবর্ষে সভ্যতার বিবর্তনে ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে দশমহাবিদ্যার রূপের সংযুক্তি ঘটিয়েছেন। অক্ষয়চন্দ্রের মতে কালী ও তারা একই সময়ের প্রতীক। আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ চলা কালের প্রতীক হলেন কালী ও তারা। ভারতে যখন শান্তি বিরাজ করছিল দ্বন্দ্ব সংঘাতের পর সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে তখনকার প্রতীক হলেন ষোড়শী ও ভুবনেশ্বরী। ভারতে যখন তন্ত্র ধর্ম গৃহীত হয় ভৈরবী সেই সময়ের প্রতীক।

যখন একদিকে স্বার্থপরতা, নৃশংসতা, কামপ্রবৃত্তির নির্জলতা এবং অন্যদিকে স্বার্থশূন্যতা বিরাজমান ছিন্নমস্তা সেই সময়ের প্রতীক। দেশে একসময়ে দেখা দেয় ভয়ঙ্কর অবস্থা। অনাহারে, দারিদ্রে বস্ত্রাভাবে ভারতবাসী আচ্ছন্ন। সেই সময়ের প্রতীক হলেন ধূমাবতী। একই অবস্থা বেশিদিন থাকে না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ভারতবর্ষ পূর্বের দুঃসময় অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয় তাই দেবী বগলা রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা। এর পরে আসবে মহাসুখ, শান্তি। কমলা সেই সুন্দর ভবিষ্যতের প্রতীক।

হেমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র দশমহাবিদ্যার রূপের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী হলেও এর মধ্যে বিবর্তনবাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। তবে এখানে একটি কথা বলবার আছে। অক্ষয় সরকার ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রতিমূর্তি হিসেবে দেবীমূর্তিগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এটিকে ভারত-বর্ষের বিবর্তনের ইতিহাস না বলে বাংলাদেশের বলাই সঙ্গত। যে চামুণ্ডাতন্ত্রে দশমহাবিদ্যার রূপ বর্ণিত হয়েছে সেটি বাংলাদেশেই রচিত। বাংলাদেশের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপকল্পনার ভিত্তিতেই দশমহাবিদ্যার রূপ কল্পিত হয়েছে বলে মনে হয়। বাংলাদেশের

ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাই দশমহাবিদ্যার রূপের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে এরূপ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

॥ ১১ ॥

(বৌদ্ধদেবীদের রূপকল্পনার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে দশমহাবিদ্যার রূপকল্পনা করা হয়েছে এমন কথা কেউ কেউ বলেন।)আমরা আগে বলেছি বৌদ্ধতন্ত্র ধর্ম হিন্দুতন্ত্র ধর্মের পূর্বে প্রবর্তিত হয়েছিল। সুতরাং বৌদ্ধ প্রভাব হিন্দু তন্ত্রে থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমরা আগে আরও বলেছি কোন কোন হিন্দু শক্তিদেবীর সঙ্গে বৌদ্ধদেবীর সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যের কথা মনে রেখে অনেকেই মন্তব্য করেছেন হিন্দু শক্তিদেবীর রূপের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব বর্তমান। এংবিষয়ে বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবেই হিন্দুতন্ত্র পরিপুষ্ট হয়েছে। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর *Indro to Sadhanmala* গ্রন্থে বলেছেন—*"The development on Tantra made by the Buddhists and the extraordinary plastic art they developed, did not fial again to create an impression on the minds by the Hindus and they readily incorporated many ideas, doctrines and Gods, originally concieved by the Buddhists in their riligion and literature."*

দশমহাবিদ্যার তারার সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের মহাচীন তারা, ছিন্নমস্তার সঙ্গে বজ্রযোগিনীর সাদৃশ্য দেখেই উপরোক্ত মন্তব্য করা হয়েছে। দশমহাবিদ্যার রূপকল্পনার মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব পড়লেও তা দোষের কিছু নয়। এই বিষয় তর্কাতর্কি বা হট্টগোলের কোন প্রয়োজন নেই। আগে কোন কিছুর প্রবর্তিত হলে পরবর্তী কালে তার প্রভাব অত্যন্ত

সঙ্গত কারণেই পড়তে পারে। হিন্দুর মূর্তি কল্পনায় বৌদ্ধ প্রভাব পড়লে মহাভারত অশুদ্ধ হওয়ার কথা নয়। এ ধরনের বিতর্ক আদৌ কাম্য নয়। বরং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত করাই যুক্তিযুক্ত। বাংলাদেশে বৌদ্ধ প্রভাব পড়বার আগে এবং আর্য আগমনের আগে বাস করতো দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মোঙ্গলীয়, তিব্বতীয় প্রভৃতি জাতিরা। এদের মধ্যে দীর্ঘকাল থেকেই শক্তি পূজার ও তন্ত্রের প্রচলন ছিল। এদের মধ্যে নানা দেব-দেবী ছিল। মাতৃকাদেবী বা শক্তিদেবীর নানারূপ এদের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল অঞ্চল বিশেষে এবং গোষ্ঠী বিশেষে। সুতরাং বৌদ্ধতন্ত্র ও বৌদ্ধ দেবী এবং হিন্দুতন্ত্র ও হিন্দু দেবী মূর্তিগুলির পরিকল্পনা একই উৎস থেকে গৃহীত হয়েছিল। এ ধরনের চিন্তা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর *obscure Religious cult* গ্রন্থে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন—"*Tantricism is neither Buddhist nor Hindu in origin : it seems to be a religious under current, originally independent on any obstruse mataphysical speculation, flowing on from an obscure point of time in the religious history of India.*"

॥ ১২ ॥

কালীর রূপ-কল্পনায় যে অনার্য প্রভাব বিদ্যমান সে কথা সকলেই স্বীকার করেন। তবে কেউ কালীর রূপ-কল্পনার মধ্যে অনার্য প্রভাব বিদ্যমানের কথা বলতে গিয়ে যে কারণ দর্শান তার সবই স্বীকার করা যায় না। কালী যে অনার্য দেবী ছিলেন তার লক্ষণ হলো—কালো রং, লোলজিহ্বা, রক্তাপ্লুত নরমুণ্ডমালা শোভিতা। নরমুণ্ডগুলি সেই যুগের নির্দেশ দেয় যে যুগে আদিম জাতিগুলি লোকের মাথা কেটে বেড়াত।

চিৎকার রত শেয়ালগুলি বন্য জীবনের ইঙ্গিত-বহ। কালীর পূজা রাত্রে হয় কেন, তার উত্তরে এঁরা বলেন—অসভ্য আদিম জাতিরা লুটপাট, চুরি, ডাকাতি করে লোকচক্ষুর অন্তরালে বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকতো এবং রাতের অন্ধকারে কালীপূজো করতো। মদ্যপান, নরবলী প্রভৃতি অনার্যগন্ধী। এ ধরনের মন্তব্যে কিছুটা সত্যতা থাকলেও মনে হয় এর মধ্যে অনার্যদের হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা আছে।

কালো রং-এর ব্যাপারটা সত্য। যাদের গায়ের রং যে রকম তাদের দেবীর গায়ের রং সেই রকমই হবে এটা যুক্তি নির্ভর তথ্য। আদিম জাতিগুলি কেবল লোকের মাথা কেটে বেড়াত তাই দেবী নরমুণ্ডমালা শোভিতা এই যুক্তি অনার্যদের প্রতি কটাক্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর্য আগমনের আগে ভারতবর্ষে সুসভ্য নাগরিক সভ্যতা ছিল। অবশ্য এই বিশাল দেশের সর্বত্রই আদিম জাতিগুলি সভ্যতার আলোক স্পর্শে ধন্য হয়েছিল এমন কথা বলা হয় না। যারা সভ্যতার সংস্পর্শে আসতে পারেনি বা যেখানে সভ্যতার আলোক পৌঁছায়নি সেখানকার মানুষ কেবলই মানুষের মাথা কেটে বেড়াত এমনতর চিন্তাও অসমীচীন। পৃথিবীর সকল দেশেই আদিম জাতিরা সেই সুদূর অতীতে খাদ্যের প্রয়োজনে নরবলি দিত। গোষ্ঠীগত সংঘাতের জন্যেও অনেক হত্যা-কাণ্ড ঘটত। এই দোষ কেবলমাত্র ভারতবর্ষের আদিম জাতির মধ্যেই ছিল না, সকল দেশেই সকল মনুষ্য সমাজে এই দোষ ছিল। যে সমস্ত আদিম মানুষেরা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিল তারাও নরবলি দিত এবং নরমাংস খেত। কৃষিকার্য আরম্ভের পূর্বে নরবলি দেওয়ার প্রথা আগে ছিল। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এইসব কুপ্রথা উঠে গেছে। মানুষ এক সময় খাদ্যাভাবে নরমাংস ভক্ষণ করত। নরমাংসের স্বাদ সুস্বাদু বোধহয় ছিল। কারণ নরমাংস ভোজন সেকালে অতি প্রিয় খাদ্যবস্তু ছিল। প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিকগণ যেমন সামনার, লোয়েব, ফ্রেজার, জনস্টন দেখিয়েছেন সকল মহাদেশেই এক সময় নরমাংস ভোজন প্রচলিত ছিল।

এই আদিম প্রথা ভারতবর্ষের আর্যদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২৪নং সূক্তে শুনশেপের উচ্চারিত স্তবে নরবলির উল্লেখ আছে। শুনশেপকে যে বলি দেওয়া হবে সে তা জানতো। তাই সে প্রার্থনা করে—"দেবগণের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর কোন্ দেবের চারু নাম উচ্চারণ করিব? কে আমাকে এই মহতী পৃথিবীতে আবার ছাড়িয়া দিবেন? যে আমি পিতা ও মাতাকে দর্শন করিতে পারি ॥ ১ ॥ দেবগণের মধ্যে প্রথম অগ্নিদেবের চারু নাম উচ্চারণ করি; তিনি আমাকে এই মহতী পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিন। যেন আমি পিতাকে ও মাতাকে দর্শন করিতে পারি ॥" ২ (অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত)। এ রূপ প্রার্থনার কারণ সহজেই অনুমেয়। এই স্তব থেকেই পরে শুনশেপ উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়েছিল। শুনশেপকে বলি দেবার বিষয়টি ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, পুরাণে এবং রামায়ণে উল্লিখিত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথম কাণ্ডের ২, ৩, ৭, ৮ অধ্যায়ে বলিদানের যে বর্ণনা আছে (পূর্বে উল্লেখ করেছি) তাতে প্রথমেই বলা হয়েছে, প্রথমত দেবতারা একটি মানুষকে উৎসর্গ করলেন। এর পর আরও অনেক জীবের উৎসর্গের কথা আছে। বুঝতে অসুবিধে হয় না আর্য সভ্যতায় নরবলি ও নরমাংস ভোজন প্রচলিত ছিল। আর্যদের দ্বারা কৃত জাতিভেদ প্রথায় ব্রাহ্মণরা ছিল সকলের শীর্ষে। এই ব্রাহ্মণরা যে নরমাংস লোলুপতা প্রকাশ করেছে তার বর্ণনা আছে মহাভারতের বনপর্বে শিবিরাজার উপাখ্যানে। এখানে দেখা যায় এক ব্রাহ্মণ একদিন শিবিরাজার নিকটে এসে বলেন আমি অন্নপ্রার্থী। তোমার পুত্র বৃহদগর্ভকে বধ কর এবং তার মাংস রান্না করে আমার জন্যে অপেক্ষা কর। শিবি রাজা ব্রাহ্মণের কথামত নিজের পুত্রকে বধ করে তার মাংস রান্না করে ব্রাহ্মণের প্রতীক্ষায় থাকেন। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে নিম্নবর্ণ মানুষের অবস্থা কি হতে পারে? নরমেধ যজ্ঞের কথা শুক্লযজুর্বেদের ৩০ ও ৩১ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এই যদি ঘটনা হয় তবে অনার্যদের হেয় প্রতিপন্ন করবার প্রচেষ্টা কেন? সত্যকে চেপে যাওয়া অতীব

নিন্দনীয়। ঋগ্বেদখানা ভালভাবে পাঠ করলে দেখা যায় গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আর্য কর্তৃক অনার্য সভ্যতা ধ্বংস, অনার্যদের অসুর, দস্যু প্রভৃতি নামে অভিহিত করা এবং তাদের হত্যা করা। অনার্যরা লোকের মাথা কেটে বেড়াত আর আর্যরা ছিল নিপাট ভাল মানুষ এরকম কথা যাঁরা বলেন তাঁরা বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি ভাল করে পড়ে দেখতে পারেন। তবে যাঁরা এমন ধরনের মন্তব্য করেন তাঁরা কিন্তু সবই জানেন। জেনে শুনেও তাঁরা সত্য প্রকাশে অনিচ্ছুক। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১নং ২১নং ৫১নং ১০৩নং ১৩১নং ১২৯নং ১৩৩নং ১০০ নং সূক্তে, ষষ্ঠ মণ্ডলের ২৭নং, অষ্টম মণ্ডলের ৯৬ নং ৯৭ নং সূক্তে, দশম মণ্ডলের ২২ নং সূক্তে আর্যদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে (আরও অনেক সূক্তে অনার্য সভ্যতা ধ্বংস এবং অনার্যদের নিধনের সংবাদ আছে। পাঠকদের সুবিধের জন্যে কয়েকটি সূক্তের উল্লেখ করা হলো)।

স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের মদ্যপান নিষিদ্ধ হলেও স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হওয়ার পূর্বে আর্যসমাজে মদ্যপান অবাধ ছিল। পুরোহিত সম্প্রদায় পানাসক্ত ছিল। অনার্যরা মদ্যপান করতো বলে তাদের দেবীপূজায় মদ্যের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে এ ধরনের মন্তব্য অনুচিত। আর অনার্যরা লুটপাট, চুরি, ডাকাতি করে বনের মধ্যে লুকিয়ে দেবীর পূজা করতো এ ধরনের চিন্তা মাথায় এসেছে অষ্টাদশ শতকে ডাকাতদের এবং বর্তমানে সমাজবিরোধীদের কালীপূজার উদাহরণ দেখে। অনার্যদের সকলেই চোর-ডাকাত ছিল না সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনায় ধনী-দরিদ্রের বাসস্থানের পৃথক ব্যবস্থা দেখে মনে হয় ধনী-দরিদ্র এই দুটি শ্রেণীর উদ্ভব তখন থেকেই হয়েছিল। আবার যারা বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে বাস করতো তাদের মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য থাকা অসম্ভব নয়। ক্ষুধা-দারিদ্র-হতাশা থেকেই সমাজ-বিরোধী হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং কিছু মানুষ যে চুরি-ডাকাতি করতো সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই দোষ আর্য সমাজেও ছিল। ঋগ্বেদে এবং যজুর্বেদে এর পরিচয় নিহিত আছে। যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে চুরি-ডাকাতির বিশদ বিবরণ আছে (এ-

বিষয়ে লেখকের ভারতে অপরাধের ইতিহাসে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)। আর ঋগ্বেদে আর্য কর্তৃক অনার্য সভ্যতা ধ্বংস ও লুটপাটের অনেক বিবরণ আছে। বহু সূক্তে অনার্যদের সম্পত্তি-খাদ্য-গরু-স্ত্রী পাইয়ে দেবার বা জোর করে এনে দেবার প্রার্থনা করা হয়েছে। আর্যরা ধোয়া তুলসী পাতা ছিল না। তাছাড়া আর্যদের মধ্যেও ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য ছিল। এদের একদল চুরি ডাকাতিতে লিপ্ত ছিল। আর্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনার্যদের অনেকেই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এরাই ইচ্ছাকৃতভাবে আর্যদের ওপর নিশ্চয়ই আক্রমণ চালিয়েছিল সুযোগ বুঝে। আর্যদের মত তারাও লুটপাট করতো।

এছাড়া কিছু মানুষ আছে যারা স্বভাব দুর্বৃত্ত। তাই বলে কালী পূজো কেবলমাত্র ডাকাতরাই করতো না। কালী পূজো ছিল সার্বিক। অনার্য সমাজে শক্তি পূজা প্রচলিত ছিল। সকল স্তরের মানুষই হয়তো দেবীর পূজায় সমবেত হতো। সমাজতত্ত্বের বিচারে এটাই সঠিক। তাই যত দোষ নন্দ ঘোষ এই প্রবাদ মনে রেখে সমস্ত দোষ অনার্যদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বিভেদের বোঝাই বাড়িয়ে তোলা ছাড়া আর কিছু হবে না। কারণ সত্যকে বেশিদিন চেপে রাখা যায় না।

॥ ১৩ ॥

শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন—"পার্বতী উমা, সতী এবং দুর্গা-চণ্ডিকার ধারা মিলিয়া পুরাণ তন্ত্রাদিতে যে এক মহাদেবীর বিবর্তন দেখিতে পাই, তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে আর একটি ধারা, তাহা হইল কালিকা বা কালীর ধারা।" পার্বতী উমা, সতী, দুর্গা, চণ্ডিকা, কালী প্রভৃতি শক্তি দেবীর ধারা পৃথক পৃথক। এই প্রতিটি ধারাই পুরাণের যুগে এবং পরে

তন্ত্রে এক মহাদেবীরূপে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়। এইসব ধারার সঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক মাতৃদেবীদের মহাদেবীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কেউই ভিন্না নন। সকলেই এক মহাশক্তির বিভিন্নরূপ মাত্র। দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে— ভারতবর্ষের যে সমস্ত গ্রামে ও নগরে যত দেবী আছেন তাঁরাও মহাদেবী রূপে পূজিতা হন। কারণ, সকলেই মহাদেবীর বিশেষ বিশেষ কলামাত্র—

কলা যা যাঃ সমূদ্ভূতাঃ পূজিতাস্তাশ্চ ভারতে।
পূজিতা গ্রামদেব্যশ্চ গ্রামে চ নগরে মুনে॥ ১।১।১৫৮-১৫৯

সমস্ত অঞ্চলেই এবং সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই দেবী ছিল। এই দেবী একদিকে তাদের কাছে ছিল শক্তির অপরদিকে প্রজনন শক্তির প্রতীক। চীন, ভূটান, তিব্বত, মোঙ্গলীয় সকলের মধ্যেই দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের মহাচীন 'তারা' চীনের দেবী বলেই পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন। কারো কারো মতে বাংলার মঙ্গলচণ্ডী মোঙ্গলজাতির উপাস্য দেবী। মোঙ্গল জাতিরা আর্য আগমনের অনেক আগেই এদেশে এসেছিল। এরা ঘাঁটি গেড়েছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। বাংলাদেশেও এরা প্রবেশ করেছিল এবং দ্রাবিড়দের সঙ্গে এদের মিশ্রণ ঘটেছিল। অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গল সকল জাতিই ছিল মাতৃভাবাসক্ত। তার মূল কারণ এদের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। প্রাচীনকালে এদেরকে বলা হতো কিরাত, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি। এদের সকলের সমাজ মাতৃ-তান্ত্রিক হওয়ায় এরা যেমন মাতৃভাবাসক্ত ছিল, তেমনি এদের উৎসব ও ক্রিয়াকর্ম সবই ছিল মাতৃভাবে পূর্ণ। সৃষ্টিশক্তি, পালনীশক্তি, প্রজনন শক্তি, ধ্বংসের শক্তি হিসেবে এরা মাতৃদেবীকেই প্রধান ও প্রথম স্থান দিয়েছিল। সুতরাং মাতৃদেবীই ছিল উপাস্য। অনার্য দেবীরা আর্যায়িত হলে আর্য গ্রন্থেও দেবীকে শবর, পুলিন্দ ও কিরাতদের উপাস্য দেবী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই দেবীরা পূজিতা হতেন পর্বতে, বনে, গুহায়। 'খিল হরিবংশের বিষ্ণুপর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

পর্ব্বতাগ্রেষু ঘোরেষু নদীষু চ গুহাসু চ।
বাসস্তব মহাদেবী বনেষু পবনেষু চ ॥
শবরৈর্ব্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা।
ময়ূরপিচ্ছধ্বজিনি লোকান্ ক্রমসি সর্ব্বশঃ ॥

উল্লিখিত আদিম জাতিগুলির দেবী পরবর্তী কালে অন্যান্য ধর্মের ওপর প্রভাব বিস্তার করে উড়িয়ে দিয়েছে তার বিজয় বৈজয়ন্তী। কিন্তু জাতিগুলির সকলের মধ্যে দেবী পূজার প্রচলন থাকলেও প্রত্যেকেরই ছিল পৃথক পৃথক দেবী। হয়তো একজাতির সঙ্গে অপর জাতির দেবীর সাদৃশ্য ছিল এবং একের প্রভাব অন্যের ওপর পড়েছিল। ইতিপূর্বে যে কয়েকটি প্রধান দেবীর উল্লেখ করেছি (বর্তমানে যাদের পূজা হয় এবং যাদের নিয়ে উৎসব হয়) তার মূলে বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র দেবীর ধারা প্রবর্তিত ছিল। পৌরাণিক যুগে সবকটি স্বতন্ত্র ধারাকে একত্র করে একটি মূল মহাদেবীর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

শক্তিদেবীর বিবর্তনের ইতিহাসে আর একটি বিষয় উল্লেখ্য। গ্রন্থের প্রথম দিকে পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম জাতিগুলির মধ্যে মাতৃদেবীর অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের নাম কি ছিল তার উল্লেখ করেছি। আদিমকালে পৃথিবীর সর্বত্রই বিভিন্ন নরগোষ্ঠী এক স্থানে থাকেনি। দিকে দিকে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল। কোন একস্থানে একদল নরগোষ্ঠী বসবাস শুরু করলেও তাদেরই একটা দল হয়তো আবার অন্যত্র ঘাঁটি গেড়েছিল। ফলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাথমিক উন্মেষের কাল থেকেই একই মূল চিন্তা-ধারা সর্বত্র ক্রমবিস্তৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও সভ্যতা ও সংস্কৃতি উন্নত হওয়ায় রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। দেবীর বিবর্তনের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। এ-বিষয়ে দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। দুর্গা বা পার্বতীর বাহন হলো সিংহ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রাচীন দেবীর বাহন ছিল সিংহ। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে দেবীপূজার সন্ধান পেয়েছেন নৃতাত্ত্বিকগণ। প্রায় প্রতি অঞ্চলের দেবীরা ছিলেন পার্বত্যদেবী এবং এই দেবীদের সঙ্গে

সিংহের যোগ ঘনিষ্ট। গ্রীক মাতৃদেবী পার্বত্যদেবী এবং এই দেবীকে সিংহ ঘিরে আছে। এই দেবীর নাম রী আফ্রোদিতে। ক্রীটের দেবীর নাম সিবিলি। রোমের দেবীর নামও সিবিলি। ক্রীট সভ্যতা গ্রীস ও রোম সভ্যতার পূর্ববর্তী। ক্রীট সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব এই দুই দেশের সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছিল। সিবিলি দেবীও পার্বত্য দেবী এবং তাঁর দুই দিকে দুটি সিংহ দণ্ডায়মান। এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে এই সিবিলি দেবীর প্রতিরূপ পাওয়া গেছে। তবে কোথাও কোথাও দেবী আসনারূঢ়া এবং পায়ের কাছে কয়েকটি সিংহ নতমুখে বসে আছে এমন মূর্তিও পাওয়া গেছে। এ-বিষয়ে পাশ্চাত্য গবেষকদের মত হলো—*"This goddess seems to have been a concept very similar to that of cybele, worshipped in Asia Minor, and we shall find traces of like beliefs elsewhere in the Mediterranean region."* (*Priests And Kings—Harold Peake and Herbert John Fleure*).

এস. কে. দীক্ষিত আরও একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ব্যাবিলনে মাতৃদেবীর নাম দেওয়া হয়েছে উম্মু বা উম্ম। এই একই শব্দ দ্রাবিড় ভাষায় উম্ম। দেবী আর্যায়িত হওয়ার পর তার নাম হয়েছে উমা। দীক্ষিতের কথায়—*"The Babylonian word for Mother is Ummu or Umma, the Accadian Ummi and the Dravidian is Umma. These words can be connected with each other, and with Uma, the mother goddess". (Mother Goddess).*

এ-বিষয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্তের প্রশ্নের আকারে মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—"প্রাচীন কালের এই মাতৃ-দেবতার বিবরণ বিচার করিয়া একথা মনে করিলে কি খুব ভুল হইবে যে, পৃথিবীর অন্যত্র যে সিংহযুক্তা পর্ব্বতবাসিনীর উল্লেখ পাই, আমাদের সিংহ বাহনা পর্ব্বতবাসিনী উমা বা পার্ব্বতী সেই দেবীরই ভারতীয় রূপ? একথা কি মনে

করা যাইতে পারে যে, একটি সাধারণ দেবী মূর্তির পরিকল্পনাই প্রাচীন কালে সব দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।" (ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য) ?

সিংহযুক্তাদেবীর ক্ষেত্রে শশিভূষণ দাশগুপ্তের প্রশ্নের আকারে মন্তব্য সঠিক। দুর্গার মহিষমর্দিনীরূপ এবং তারার রূপ যে ভারতের বাইরে থেকে এসেছে তা আগেই উল্লেখ করেছি। পার্বতী-দুর্গা-চণ্ডী-কৌশিকী কাত্যায়নী প্রভৃতি দেবী সম্পর্কে বলেছি রক্তমাংসের মানবীকে বিশেষ বিশেষ গুণের জন্যে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কালীর রূপকল্পনার মধ্যেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। কোন অঞ্চলে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে (বাংলাদেশেও হতে পারে) কোন নারী হয়তো সর্বদা উলঙ্গ হয়ে ঘুরতো—শত্রুকে অনায়াসে হত্যা করতো—হয়তো শত্রুর ছিন্ন মস্তক হাতে নিয়ে হা হা রবে চারিদিক প্রকম্পিত করতো—কাঁচা-মাংসের প্রতি ও মদের প্রতি লোভ ছিল—তার এক হাতে সর্বদাই খড়্গ থাকতো—শ্মশানে ঘুরে বেড়াতো—শেয়াল কুকুর হয়তো তার পিছে পিছে ঘুরতো। হয়তো এই নারীর আকৃতি ও প্রকৃতি ভয়ংকর ছিল—অল্পেই ক্রোধে উন্মত্ত হতো—একটু খাতির করলে তুষ্ট হতো—শত্রুর হাত থেকে নিজের গোষ্ঠীকে বারে বারে রক্ষা করেছিল—সব রকমের বিপদের রক্ষাকর্ত্রীরূপে গোষ্ঠীর সকলের শ্রদ্ধা লাভ করেছিল—অনেক ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষও এই নারীর ভয়ে ভীত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছিল—এই নারীর জন্যেই অন্য গোষ্ঠীর ও অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হয়েছিল। জীবিত কালেই যে সকলকে বশ করতে এবং সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল মৃত্যুর পর তাকেই সম্পূর্ণ-ভাবে দেবীরূপে পূজা করা শুরু হয়েছিল সৃষ্টি-ধ্বংস ও বিপদের রক্ষা-কর্ত্রীর প্রতীক হিসেবে। এই ব্যবস্থা পরে ক্রমবিস্তৃত হয়েছে।

কালী-দুর্গা-চণ্ডী-পার্বতী-কাত্যায়নী-তারা-কৌশিকী প্রভৃতি দেবীর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। মানবীয় রূপ, গুণ, দোষের আধারেই দেবীরূপ পরিকল্পিত হয়েছে। দেব-দেবীর আকৃতি ও প্রকৃতিতে মানুষ

নিজেদের রং, রূপ, গুণ, দোষ আরোপ করেছে। সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব উভয়দিক থেকেই মানুষের এই কাজ সঙ্গত। কোন দেব-দেবীই আকাশ থেকে নেমে আসেননি বা মানুষ স্বর্গ বলে যা কল্পনা করেছে সেই স্বর্গ থেকে নেমে আসেননি। প্রতিটি দেব-দেবীই এই মর্তের মানব-মানবী। বিভিন্ন সমাজ জীবনের পটভূমিকায় বিভিন্ন দেবীরূপের প্রকাশ ঘটেছে। কোন জীবন্ত মানবীকেই দেবীরূপে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে (এ যুগেও কেউ কেউ দেব-দেবীর মতই সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি পেয়েছেন)। অবশ্য শুধুমাত্র শ্রদ্ধাই প্রদর্শিত হয়নি, কিছুটা ভীতিও ছিল। দেবীকে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনের পেছনে ভীতি ও শ্রদ্ধা উভয়ই যুগপৎ বর্তমান ছিল। সমাজ বিবর্তনের ফলে সমাজ জীবনের পটভূমিকায় মূলটুকু বজায় রেখে দেবীর আকৃতি ও প্রকৃতিতে কিছুটা বিবর্তন অবশ্যই ঘটেছিল।

পৌরাণিকযুগে অনার্যদেবীরা আর্যায়িত হওয়ার সময় তাদের নিয়ে যেমন গল্প ও কাহিনী গড়ে উঠেছিল তেমনি নানাবিধ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হয়েছিল আর্যদেবমণ্ডলীতে স্থান দেওয়ার জন্যে। পৌরাণিক কাহিনী-গুলির মধ্যেও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু পুরাণের আধ্যাত্মিকতা-বাদ দিয়ে যে কাহিনী পাওয়া যায় তা গড়ে উঠেছে বহুকালের বহু গল্প ও কাহিনীর ভিত্তিতে। অবশ্য এইসব কাহিনীর মধ্যে অতিকথন, অতি-রঞ্জন আছে। লৌকিক গল্পের ভিত্তিতে পুরাণগুলি রচিত হওয়ায় তার মধ্যে অনেক গুজব স্থান পেয়েছে। দেবী সম্পর্কে কোন গল্পকথা (শুধু দেবী সম্পর্কে নয়, যে কোন বিষয় সম্পর্কেই এটি সত্য) বহুকাল ধরে লোকের মুখে মুখে ফিরতে ফিরতে তার মধ্যে সত্য-মিথ্যা অনেক কিছুই প্রবেশ করেছে বা সংযোজিত হয়েছে। হয়তো যা ছিল সামান্য ব্যাপার তাই অতিকথনে ও অতিরঞ্জনে ফুলে ফেঁপে একটা বিরাট আকার নিয়েছে। যাকে অতিরঞ্জন ও অতিকথন বলছি আসলে তাই হলো গুজব। গুজব ছড়াতে ছড়াতে তা যে কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাতে পারে আধুনিক কালের মানুষ সে-বিষয়ে সম্যক অবহিত আছেন। গুজব দু ধরনের—

ক. কোন ঘটনা মানুষের মুখে ফিরতে ফিরতে বিরাট আকার নেয় এবং তার মধ্যে এমন অনেক কথা ঢুকে পড়ে যা আদৌ সত্য নয়। খ. সম্পূর্ণ-ভাবে একটা মিথ্যাকে কেন্দ্র করে গুজব রটতে থাকে এবং তার ফলে অনেক সময় অনর্থ ঘটে থাকে। অবশ্য এ ধরনের গুজবের পেছনে একটা অসৎ উদ্দেশ্য থাকে। তিলকে তাল করার এবং গুজব ছড়ানোর প্রবণতা মানুষের স্বভাব। প্রাচীন কালের অনেক ঘটনাই বা পরবর্তী সময়ে গৃহীত ও লিখিত হয়েছে তার মধ্যে সত্যের সঙ্গে অনেক মিথ্যাও বর্তমান।

দেবীর বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায় মানবীয় মূর্তির পরিমণ্ডলে মানবীর দোষ ও গুণগুলিকে বিশেষত গুণগুলিকে মহিমান্বিত করে নেওয়া হয়েছে বাস্তব জীবনের সঙ্গে দেবীকে যুক্ত করবার মানসে। পৌরাণিক কাহিনী বা তন্ত্র গ্রন্থের মধ্যে এই ভাবটি যত না প্রকটিত তার থেকে অনেক বেশি প্রকটিত সাহিত্যে। সাহিত্যে নানা লৌকিক কাহিনী নানাভাবে নানারূপে স্থান পেয়েছে। সাহিত্যে দেবী সম্পর্কিত আলোচনা আমাদের বিষয় নয়। সুতরাং এ কাজ থেকে আমরা বিরত থাকছি। শুধু বাংলা সাহিত্যের একটি বিষয় উল্লেখ করবো যা দেবীর বিবর্তনের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ।

॥ ১৪ ॥

দেবী সাকার হোন বা নিরাকার হোন, নির্গুণ হোন বা সগুণ হোন, ভয়ংকরী হোন বা মধুর স্বভাবা হোন, সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্রী হোন তা নিয়ে বাংলার সাধক কবিদের তত মাথা ব্যথা বা মাতামাতি বা বিতর্ক নেই। মহাশক্তিরূপিণী দেবীকে তাঁরা আপন আত্মার আত্মীয় করে নিয়েছেন। শক্তিদেবীর বিবর্তনে ও মাতৃসাধনায় এ এক অভিনব ব্যাপার। সাধকের কাছে দেবী কখনো মা কখনো মেয়ে। *S. B. Dasgupta* তাঁর '*Evolution of Mother Worship in India*' গ্রন্থে বলেছেন—"*If it be a fact, as the modern trend is to believe, that it is the human mother who has given*

rise to the Divine mother in her turn or in return, has added majesty and glory to the human mother."

বিশ্বমাতা কেবলমাত্র বিশ্বের মা নন, তিনি ঘরের মা। তন্ত্রের ভয়ংকরী শক্তি হয়েছেন পুত্র বৎসলা, শুভংকরী, প্রেমময়ী। আবার বাৎসল্য রসে সাধক হয়েছেন মা আর শক্তি হয়েছেন মেয়ে। সাধকের কাছে শক্তিদেবীর এই রূপান্তরের ফলে মানবী মা আরও মহত্ত্ব ও গৌরব লাভ করেছেন। আদিমাতার শাস্ত্রীয় রূপ সাংসারিক রূপে বিবর্তন বাঙালী সাধকের নিজস্ব। এর ফলে শক্তিময়ী দেবীর জনপ্রিয়তা যেমন তুঙ্গে উঠেছে তেমনি বহু মানুষের অন্তরে তাঁর স্থান অক্ষয় হয়ে আছে। সাধকের কাছে দেবী, একবার মা আরেকবার মেয়ে। কিন্তু দেবী ভয়ংকরী, শক্তিময়ী, কঠোর। সেই দেবীই সাধকের কাছে স্নেহময়ী কোমল, কৃপাময়ী, বরাভয়-দাত্রী এবং কন্যার মত আদরিণী। চণ্ডীর কয়েকটি স্তব এ-বিষয়ে সাধকদের অনুপ্রাণিত করেছে বলে মনে হয়। দেবতারা দেবীকে বলেছেন—

কোনোপমা ভবতু তেহস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রু ভয়কার্য্যতি হারি কুত্র।
চিত্তে কৃপাসমর নিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা।
ত্বয্যেব দেবী বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪র্থ অধ্যায়)

দেবী, আপনার পরাক্রমের কোন তুলনা নেই। আপনার সৌন্দর্য শত্রু-ভীতিকর হলেও মনোরম। একমাত্র আপনার মধ্যেই দেখা যায় যুগপৎ কৃপা ও সমর নিষ্ঠুরতা। দেবতাদের এই স্তবের ফলেই বাংলার সাধকগণ ঐশ্বর্যের মধ্যে মাধুর্যের সংমিশ্রণ ঘটাবার অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। 'আগমনী বিজয়ার' গানে ভগবতী স্নেহের দুলালী কন্যা আর 'ভক্তের আকুতি'-তে আছে মায়ের কাছে সন্তানের আকুতি অর্থাৎ অভিযোগ, অভিমান, আবদার, মিনতি, ক্রোধ, কৃপা, কামনা এবং একান্ত নির্ভরতা। 'আগমনী-বিজয়ার' গান দুর্গাপূজার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করেছে। আর কালীপূজায় শক্তির কাছে ভক্ত প্রকাশ করে তাঁর একান্ত নির্ভরতা। বাংলার এই শক্তিসাধনা তাই বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

উপসংহার

Winternitz তাঁর *A History of Indian Literature*' গ্রন্থে বলেছেন—"*The Great Sakti, the Great Mother, the Goddess, who inspite of her countless names (Durga, Kali, Chandies) is one only the Highest Queen (Parameswari).*" ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে দেবীর সংখ্যা প্রচুর। যে বাংলা শক্তিসাধনার অন্যতম প্রধান পীঠস্থান সেই বাংলার বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-কন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে দেবীর সংখ্যা কম নয়। সমস্ত দেবীই লৌকিক এবং অবৈদিক। তবে সমস্ত দেবী একই কালে উদ্ভূত হননি। কালে কালে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের দেবীর আরাধনা ও পূজা প্রচলিত হয়েছে। সেই জন্যে একের ওপর অন্যের প্রভাব বিদ্যমান থাকা অসম্ভব নয়। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ, সতীকে নিয়ে মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য, বিষ্ণু-কর্তৃক সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর অঙ্গচ্ছেদ, একান্ন স্থানে সতীর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ পতিত হওয়ায় একান্ন পীঠের জন্ম—এসব নেহাতই গল্প কথা। একান্ন পীঠের প্রসঙ্গে যে সমস্ত দেবীর উল্লেখ আছে আসলে তাঁরা প্রত্যেকেই স্থানীয় দেবীরূপে পূজিতা হতেন। একান্ন পীঠের দেবীদের মধ্যে কোন কোন দেবীর মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যের কথা মনে রেখে একের ওপর অন্যের প্রভাব আছেই একথা জোর দিয়ে বলা চলে না। তবে প্রভাব থাকাটা অসম্ভব নয়, বিশেষত পাশাপাশি অঞ্চলের দেবীদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে। একান্ন পীঠের দেবীদের প্রতিষ্ঠাকাল এক নয়। কেউ আগে কেউ পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সুতরাং প্রভাবের প্রশ্নটি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এই একান্নপীঠের দেবীরা ভিন্ন বাংলায় মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, ওলাই চণ্ডী, বনবিধি প্রভৃতি অনেক আঞ্চলিক দেবী আছেন। দশমহাবিদ্যায় দেবীর যে দশটি রূপের কল্পনা চামুণ্ডা তন্ত্রে করা হয়েছে তাঁরাও এবং বৌদ্ধ দেবীরাও আঞ্চলিক দেবী। অবশ্য বৌদ্ধদেবীদের কিছু কিছু ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছে। (পূর্বে আলোচনা করেছি)। চীন, ভূটান, তিব্বত, নেপাল, মোঙ্গলদেশের

অধিবাসীদের সঙ্গে একসময় বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বাংলার সংস্কৃতিতে বিশেষত ধর্মের ক্ষেত্রে এদের অবদান কিছুমাত্র কম নয়।

এই প্রসঙ্গে তন্ত্রের ষটচক্রের দেবীদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তন্ত্র সাধনা মূলত দেহসাধনা। এই সাধনার মধ্যে ষটচক্রের কথা সুবিদিত। দেহের অভ্যন্তরে আত্মার চৈতন্য উদ্বোধনে সহায়ক যে প্রাণশক্তি বিদ্যমান, তিনি কুলকুণ্ডলিনীরূপে মূলাধারে নিদ্রিত, তাঁকে ষটচক্রের মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে সহস্রারে শিবের সঙ্গে একীভূত করাই হলো তন্ত্রসাধনা। মূলাধার চক্র থেকে আজ্ঞা চক্র পর্যন্ত ছটি চক্র এবং এই ছটি চক্রের ছটি দেবী আছেন। এরা হলেন—ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী, হাকিনী। ডাকিনী দেবী তিব্বত থেকে এবং লাকিনী ও হাকিনী দেবী ভূটান থেকে বাংলায় প্রবেশ করেছে (ভূটানে লাকিনী ও হাকিনী দেবীর সন্ধান পাওয়া গেছে)। বাংলায় এরা পৃথক দেবী মূর্তিরূপে পূজিতা না হলেও তন্ত্রের ষটচক্রের দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে। সেই সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কোন্ কোন্ দেবী প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন তার একটা তালিকা মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে আছে। এই তালিকাটিকে সম্পূর্ণ তালিকা বলা চলে না। কিন্তু মোটামুটিভাবে তালিকাটি থেকে বাংলার দেবীদের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিটি দেবীই স্থানীয় দেবী। পাঠকদের অবহিতির জন্যে দেবীদের তালিকাটি উদ্ধার করা হলো। দেবীরা হলেন—কালী (কালীঘাট), জয়দুর্গা (ফুলিয়া), ঝকবুড়ী (বৈতাল), খেপাই (খপু), মেলাই (আমতা), রুক্মিণী (মৌলা), বিশালা (বিক্রমপুর), বিশালা (বড়দা), রাজবল্লভী (রাজবলহাট), বাসুলী (শিয়াখালা) সর্বমঙ্গলা (বেতায়), সর্বমঙ্গলা (বর্ধমান), হিঙ্গু লাটেশ্বরী (হিঙ্গুলা), কামাখ্যা (কামরূপ), ঢাকেশ্বরী (ঢাকা), অপর্ণা (আড়ু), কিরীটেশ্বরী (কিরীটকোণা), বিরজা (যাজগ্রাম),

অষ্টভুজা (আশ্বিন কোটরা), সাপরূপা (সেনবাহিড়), মহাকালী (খাতর), ঘাঁট্‌দেবী (পড়াশ), সর্বমঙ্গলা (লাড়চা), বিশালা (আন্দুড়), থানেশ্বরী (মগরা), দন্তেশ্বরী (নাও গ্রাম), লক্ষ্মী (লক্ষ্মীপুর), চণ্ডী (বুঞ্ঝায়), বিশালাক্ষ্মী (বঙ্গপুর), মনসা (মানপুর), ত্রিপুরা সুন্দরী (ছিরামপুর), বাশুলী (ছাতনা), কালী (রায়খা), বর্গভীমা (তমলুক), শুভাদেবী (শালঘাট), লক্ষ্মী (শাটীনন্দ), পলাশচণ্ডিকা (পলাশি), ভাতারচণ্ডী (ভাণ্ডারগড়), নৃমুণ্ডমালিনা (সর্মিখী), যষ্ঠা (তালপুর), ভগবতী (গোগ্রাম), ষষ্ঠী (ময়নাপুর)।

এই তালিকা ছাড়াও আরও অনেক আঞ্চলিক দেবী আছেন। এঁদের নাম—ওলাই চণ্ডী, কলায় চণ্ডী, লাটাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, কুলাই চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, বসন চণ্ডী, খাড়া চণ্ডী, জয় কালী, ভীমা, উমা, মহামায়া, চণ্ডিকা, বাড়েশ্বরী, যোগাদ্যা, বেড়াই চণ্ডী, বল্লভা, ভদ্রকালী, শ্যামরূপা, সর্বজয়া, জয়মঙ্গলা, অম্বিকা, সিদ্ধেশ্বরী, কালিকা, মুণ্ডেশ্বরী, বিষহবি, ভুজঙ্গ জননী, কমলা, জগৎগৌরী, নাচনচণ্ডী, বেতাইচণ্ডী প্রভৃতি।

পদ্মপুরাণের সৃষ্টি খণ্ডে (১৭ / ১৮৪-২১১) এবং বিভিন্ন পুরাণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত দেবীরা প্রতিষ্ঠিত তার একটা করে তালিকা আছে। সব গ্রন্থগুলির মধ্যে তালিকায় কিছু কিছু অমিল থাকলেও মোটামুটিভাবে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এইসব তালিকাও সম্পূর্ণ নয়। উল্লিখিত তালিকার বাইরেও অনেক দেবী আছেন যাঁদের উল্লেখ করা হয়নি। বিশেষ সামাজিক পটভূমিকায় যুগে যুগে বিভিন্ন নরগোষ্ঠী শক্তির বন্দনা করেছে। সমস্ত দেবীই বিবর্তনের পথে পৌরাণিক কালে এক মহাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এত অসংখ্য দেবীর মধ্যেও তিনটি শক্তিময়ী দেবীর মূল ধারা ছিল। এই তিনটি ধারা হলো—১. পার্বতী ও উমার ধারা, ২. চণ্ডীর ধারা, ৩. কালীর ধারা। এতগুলি দেবী থাকলেও গায়ের রং প্রধানত দু-রকমের এক—গৌরী, দুই—শ্যামা। যে সমস্ত দেবীর রং গৌরী তাঁরা

পূজিতা হতেন উত্তর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের কিছুটা অংশে আর ভারতের বাকী অংশের দেবীরা ছিলেন শ্যামবর্ণা। তবে পৌরাণিক কালে আর্যদের ছোঁয়া পেয়ে অনেক দেবী গৌরবর্ণা হয়েছেন। অধিকাংশ শক্তিময়ী দেবীর ভীতি, ভয়ংকরত্ব, রহস্যময়তা, যৌনাচার প্রভৃতি আদিম কৌম সাধনার ইঙ্গিত দেয়। *Payne* বলেছেন—*"Saktism answers to many fears and passions, that are deep in the human soul, and seems to be a part of the universe".*

মাতৃতান্ত্রিক সমাজেই মাতৃদেবীর উদ্ভব এবং পরবর্তী কালে তার বিকাশ। এখন প্রশ্ন হতে পারে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজেই যদি মাতৃদেবীর উদ্ভব ঘটে থাকে তাহলে পৃথিবীর অনেক স্থানেই তো মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল প্রাথমিক যুগে। হ্যাঁ, প্রাথমিক যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই যেখানে কৃষিনির্ভর অর্থনীতির প্রবর্তন হয়েছিল সেখানেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। (কৃষিভিত্তিক সমাজে কি ভাবে মাতৃদেবীর উদ্ভব হয়েছিল তার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে)। এবার প্রশ্ন আসতে পারে তবে ভারতবর্ষে কেন মাতৃদেবী তথা শক্তিদেবীর এত রমরমা এবং পৃথিবীর অন্যত্র শক্তিদেবীর প্রাধান্য নেই কেন ? প্রশ্নটি জটিল সন্দেহ নেই। পৃথিবীর অন্যত্র মাতৃদেবীর অস্তিত্ব ছিল ভারতে কোন কোন মাতৃদেবীর সঙ্গে তাদের সাদৃশ্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সত্যিই তো একসময় যাঁদের অস্তিত্ব ছিল এবং যাঁরা দেব-দেবী সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল আজ তাদের এমন দৈন্যদশা কেন ?

এসব জটিল প্রশ্নের সমাধান সহজ ব্যাপার নয়। তবে দু-একটি যুক্তি অবশ্যই দেওয়া যেতে পারে। উক্ত জটিল প্রশ্নের জবাবে একটি পাল্টা প্রশ্ন করা যেতে পারে। ভারতবর্ষ যখন সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত ছিল তখন ইউরোপের অধিকাংশ স্থানেই সভ্যতার আলোক-বর্তিকা পৌঁছায়নি। ইউরোপে সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল অনেক পরে। এবার প্রশ্ন—যারা অনেক পরে সভ্য হয়েছিল তারা কি করে পরবর্তী সময়ে

ভারতবর্ষকে পেছনে ফেলে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিক্ষায়, শিল্পে এগিয়ে গেল ? অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে উত্তরণের কোন প্রচেষ্টা এদেশে হয়নি, কিন্তু ইউরোপে হয়েছিল। ধর্মান্ধতা, জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা, শাস্ত্র গ্রন্থগুলির কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্দেশ, সার্বিক ঐক্যের অভাব, অনৈক্য এবং জাতীয় চেতনা সৃষ্টি প্রচেষ্টার অভাব প্রভৃতির জন্যেই ভাবতবর্ষের অগ্রগতি ঘটেনি। বৌদ্ধ অভিঘাতের ফলে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একত্রিত করবাব মানসে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অনার্য দেবীদের স্থান দিয়ে পৌরাণিক কাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল এবং দেব-দেবী নিয়ে অত্যধিক মাতামাতি শুরু হয়েছিল যার রেশ আজো বর্তমান। তাছাড়া আর্য আগমনের আগে থেকেই এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তান্ত্রিক ক্রিয়াচার ও শক্তিসাধনা ছিল। শুধু ছিল না অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। পৃথিবীর অন্যত্র এরূপ ঘটনা ঘটেনি। ফলে ভারতবর্ষে শক্তিদেবী প্রাধান্য পেয়েছে। আদিমকালে যার উদ্ভব সেই ধারা ক্রমবিবর্তনেব পথ ধরে এখনো অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে। অন্যদিক দিয়ে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু শক্তিসাধনার ধারা ক্রম-বিস্তৃত হয়েছে। আশা করা যায়, এর মধ্যে জটিল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

গ্রন্থপঞ্জী

অতুল সুর	সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও অবদান
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ	তন্ত্রসার
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ
বিনয়তোষ ভট্টাচার্য	বৌদ্ধদের দেবদেবী
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি	পূজা পার্বণ
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	দশমহাবিদ্যা
অক্ষয়চন্দ্র সরকার	দশমহাবিদ্যা
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী	তন্ত্রকথা
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার	মহানির্বাণতন্ত্র
A. K. Sur	Pre-Aryan Elements in Indian Culture.
	Beginnings of Lingacult in India
	Dynamics of Synthesis in Hindu culture
Boas	General Anthropology
Clodd	Animism and Fetishism
Gordon Child	The Aryans
	Evolution of Society
S. K. Diksit	Mother Goddess
S. B. Dasgupta	Obscure Religious cults
R. G. Bhandarkar	Vaishnavism, Saibaism and Minor Religious sects.
Sri Aurobindo	Mother
Winternitz	A History of Indian literature vol-I

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, পদ্মপুরাণ, কালিকা পুরাণ, দেবী ভাগবত, বায়ুপুরাণ, শ্রীশ্রীচণ্ডী, মহাভারত, মার্কেণ্ডেয় পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

নির্ঘণ্ট

লেখকের অন্যান্য বই

কালিদাসের নবমূল্যায়ন

মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষসের মূল্যায়ন

বাংলা নাটক সমীক্ষা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগ্রামী কারা

মানুষের ক্রমবিকাশ সভ্যতা ও সংস্কৃতি (১ম, ২য়)

সাহিত্য সংজ্ঞা ও সাহিত্যতত্ত্ব অভিধান

ভারতের অপরাধের ধারা (যন্ত্রস্থ)

উপন্যাস ব্যাখ্যা : বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক (যন্ত্রস্থ)

কিশোরদের জন্য

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালী

বিদেশী আন্দোলনে বাংলা সাহিত্য